মাসিক
আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-১০, সংখ্যা-১০

অক্টোবর ২০২১ ইং, রবিউল আওয়াল ১৪৪৩ হি., আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৮ বাং

ربيع الاول ١٤٤٣هـ، اكتوبر ٢٠٢١م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.facebook.com/মাসিক আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
‘ফাজায়েলে আমাল’ নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৭৭......... ৮
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১০
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
ইসলামে নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলদের জরুরি গুণাগুণ-৭...১২
“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ :
‘দরকার মজবুত ঈমানের’...................................১৬
শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব (দা.বা.)
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ মহা অপরাধ ২২
শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী (দা.বা.)
আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস আল্লাহর জিকির-২............. ৩২
মুফতী শরীফুল আজম
খাদ্য ও পানীয়ের শরঈ নীতিমালা-৬..................... ৩৯
মুফতী মাহমুদ হাসান
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৫

মোবাইল : প্রধান সম্পাদক : ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক : ০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক : ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক : ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯ বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি : ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও মুহাব্বত ঈমানের অঙ্গ, অবিচ্ছেদ্য অংশ। নবীজি (সা.)-কে কেমন ভালোবাসতে হবে, কিভাবে ভালোবাসলে ভালোবাসার হক আদায় হবে, তা পবিত্র কোরআন-হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব আমল থেকে স্পষ্ট জানা যায়। হাদীস শরীফে এসেছে,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَد عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :يَا رَسُولَ الله، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :فَإِنَّهُ الآنَ، وَالله، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :الآنَ يَا عُمَرُ!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হেশাম বর্ণনা করেন, একদিন আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। নবীজি ওমর (রা.)-এর হাত ধরা ছিলেন। ওমর (রা.) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার কাছে সব কিছু থেকে প্রিয়, তবে আমার জান ছাড়া। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না ওমর, এতে হবে না। যে সত্তার হাতে আমার জান তাঁর কসম! (ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না,) যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার জানের চেয়েও প্রিয় না হই। পরক্ষণেই ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ,
এখন তা হয়েছে; আল্লাহর কসম! (এখন থেকে) আপনি আমার কাছে আমার জানের চেয়েও প্রিয়। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, ওমর! এখন হয়েছে। (বোখারী, হা. ৬৬৩২)

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ :مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا...

তিনটি গুণের অধিকারী ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে। তন্মধ্যে প্রথম হলো, যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে প্রিয় হবে। (মুসলিম, হা. ৬৭)

নবীজি (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার প্রধান আবেদন হলো, মানুষের জীবন পরিচালনায় সর্ব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথকেই আঁকড়ে ধরা। যাবতীয় বিষয়ে সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ-অনুকরণ করা। সীরাতে রাসূলকে প্রত্যেকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা। দুনিয়াবী যাবতীয় আবেদন এবং উখরবী যত অর্জন একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাতলানো পথে পূরণ ও হাসিল করার চেষ্টা করা। অন্য সব নীতি-আদর্শ, মন্ত্র-তন্ত্র তা যতই চাকচিক্যপূর্ণ হোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের সামনে হীনজ্ঞান করা। মানব রচিত সর্বপ্রকার রীতি-নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথের সৈনিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। বিশ্বনবী (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ ও চাহিদার সামনে নিজের সব কিছু ত্যাগ করার নামই হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা প্রদর্শনে প্রধান নমুনা। তাঁরা নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রকাশে। এভাবেই তাঁরা হয়ে উঠেছেন নবী-রাসূলগণের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে।

বিশ্বনবীর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসার বর্ণনা করেন হযরত ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মুশরিকদের পক্ষে কথা বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়েছিলেন। হুদাইবিয়া থেকে ফিরে ওরওয়াহ তাঁর কওমকে বিশ্বনবীর প্রতি সাহাবাদের সম্মান ও ভালোবাসার অনুভূতি সম্পর্কে বলেছিলেন–

‘আমি অনেক রাজা-বাদশাহর কাছে প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছি। কায়সার, কিসরা ও নাজ্জাশির দরবারেও গিয়েছি। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাহাবারা যেমন ভক্তি করে, কোনো বাদশাহর প্রতি তাঁর সঙ্গীদের এমন ভক্তি আমি আর কোথাও দেখিনি। আল্লাহর কসম! তিনি থুতু ফেললে তাঁর সঙ্গীদের কেউ না কেউ তা হাতে নিয়ে চেহারায় ও শরীরে মেখে ফেলে। তিনি যখন কোনো আদেশ করেন, তখন তারা তাঁর আদেশ পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর যখন তিনি অজু করেন তখন তাঁর ওজুতে ব্যবহৃত পানি পাওয়ার জন্য প্রায় লড়াই বেধে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে যায়।’ (বোখারী শরীফ)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

وَعَنْ أنس قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تصبح وتمسي لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحَد فَافعَلْ ثُمَّ قَالَ :يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ من سنتي وَمن أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجنَّة .رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে বৎস! তুমি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার অন্তরে কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রেখে কাটাতে পারো তাহলে তাই করো। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে বৎস! এটা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (তিরমিযী)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।” (সূরা আলে ইমরান, ৩১ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার হক আদায়ে একজন উম্মতকে যেসব বিষয়ের ওপর অবিচল থাকতে হবে তা নিম্নরূপ :

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ঈমান আনা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

لتُؤْمنُوا باللَّه وَرَسُوله وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصيلاً

যাতে হে মুমিন! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁকে সাহায্য করো ও তাঁকে সম্মান করো এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করো। (সূরা ফাতাহ ৯)

২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করা।

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

'(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ করো। আর যদি তাঁরা বিমুখতা অবলম্বন করেন, তাহলে আল্লাহ কাফেরদের ভালোবাসেন না।' (সূরা ইমরান : আয়াত ৩২)

৩. রাসূল (সা.)-এর আদেশ পালন এবং নিষেধ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বেঁচে থাকা।

ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ (الحشر: ٧)

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো।" (সূরা হাশর, ৭ আয়াত)

৪. সব কিছু থেকে বেশি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখা।

قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِده وَوَلَده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয় হবো। (বোখারী শরীফ ১৫)

৫. রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার আকীদা পোষণ করা।

عَنْ جابر بْن عَبْد اللَّه رَضيَ اللَّهُ عَنهُما أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ

হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমি নবীদেরও সরদার, তাতে আমার কোনো গৌরব নেই। আমি সর্বশেষ নবী তাতে কোনো গৌরব নেই, আমি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী তাতে কোনো গৌরব নেই। (সুনানে দারেমী, হা. ৫০)

৬. নবী করীম (সা.) সর্বশেষ নবী হওয়ার আকীদা পোষণ করা।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

হে মুমিনগণ! মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (আহযাব ৪০)

৭. রাসূলুল্লাহ (সা.) মাসুম এ কথার দৃঢ় আকীদা পোষণ করা।

الانبياء عليهم السلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح يعنى قبل النبوة وبعدها (شرح الفقه الاكبر ١٣٢)

৮. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মত ও পথের সামান্য বিরোধ থেকেও নিজেকে রক্ষা করা।

وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً

আর যে ব্যক্তি তাঁর সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনোও পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা। (নিসা ১১৫)

৯. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসার নামে সীমাতিরক্ততা পরিহার করা। যেমন এমন কোনো গুণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য সাব্যস্ত না করা, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা আমার এমন অতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমন ঈসায়ীরা ঈসা (আ.) সম্পর্কে অতিরঞ্জিত করেছে। আমি আল্লাহ তা'আলারই বান্দা। তাই বলো আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। (বোখারী শরীফ, হা. ৩৪৪৫)

১০. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً

কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছে তারাই হবে, যারা আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করে। (তিরমিযী শরীফ, হা. ৪৮৪)

১১. আহলে বাইতের সাথে মুহাব্বত রাখা।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي

আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসো। কারণ তিনি তোমাদের নিয়ামত দান করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বতের কারণে আমাকে মুহাব্বত করো। আর আমার মুহাব্বতের কারণে আহলে বাইতের সাথে মুহাব্বত রাখো। (তিরমিযী শরীফ, হা. ৩৭৮৯)

১২. সাহাবায়ে কেরামের সাথে মুহাব্বত রাখা।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ،

আমার সাহাবীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমার পর তাদেরকে গালমন্দের নিশানা বানিয়ো না। যে তাদের ভালোবাসে সে আমার জন্য তাদেরকে ভালোবাসে, যে তাদের সাথে দুশমনী রাখে মূলত সে আমার সাথে দুশমনীর কারণে তাদের সাথে দুশমনী রাখে। (তিরমিযী শরীফ, হা. ৩৮৬২)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসার পরিপূর্ণ হক আদায় করার তওফীক দান করুন। আমীন।

আরশাদ রহমানী

ঢাকা।

২৮/০৯/২০২১ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٦٨) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٩)

৬৮. বলে দিন! হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কোনো পথে নও, যে পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং "যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে" তাও পুরোপরি পালন না করো। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধিই পাবে। অতএব এই কাফের সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।

৬৯. নিশ্চয়ই যারা মুসলমান, যারা ইহুদি, সাবেয়ী এবং খ্রিস্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

আহলে কিতাবদের প্রতি শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ : প্রথম আয়াতে আহলে কিতাব, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি তোমরা শরীয়তের নির্দেশনাবলি প্রতিপালন না করো, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ক্রিয়া-কর্ম পণ্ডশ্রম মাত্র। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান করেছেন; অর্থাৎ তোমরা পয়গম্বরদের বংশধর। দ্বিতীয়ত, তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়ত্তাধীন; তোমাদের মধ্যে অনেক সাধু ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে, কিন্তু এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবে। এ ছাড়া কোনো সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার কোনোটিতেই তোমাদের মুক্তি আসবে না।

এ আয়াত থেকে মুসলমানরাও নির্দেশ লাভ করেছে যে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ব্যতীত সাধুতা, আধ্যাত্মিকতা, চেষ্টা-সাধনা, অন্তর্দৃষ্টি লাভ, ইলহাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তি লাভ করা যাবে না।

এ আয়াতে শরীয়ত অনুসরণের জন্য তিনটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রথম তাওরাত, দ্বিতীয় ইঞ্জিল, যা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তৃতীয় وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে। সাহাবা ও তাবেয়ী তাফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে এর মর্ম কোরআন পাক, যা খ্রিস্টান, ইহুদি সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই–যে পর্যন্ত তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের আনীত বিধি-বিধানগুলো বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বংশগত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য হবে না।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে আয়াতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের মতো কোরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য কী? সম্ভবত এতে কতিপয় হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার কোরআন দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যান্য তত্ত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। এগুলোকে একদিক দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। হাদীসের ভাষা এরূপ,

الا اني اوتيت القران ومثله معه الا يوشك رجل شبعان علي اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه وان ما حرم رسول الله كما حرم الله

"শোনো! আমাকে কোরআন দেওয়া হয়েছে এবং তৎসহ অনুরূপ আরো কিছু। ভবিষ্যতে এমন হবে যে কোনো তৃপ্ত ও আরাম প্রিয় ব্যক্তি কেদারায় বসে বলাবলি করবে যে তোমাদের জন্য কোরআনই যথেষ্ট। এতে যা হালাল আছে,

তাকেই হালাল মনে করবে এবং এতে যা হারাম আছে, তাকেই হারাম মনে করবে। অথচ বাস্তব সত্য এই যে আল্লাহর রাসূল (সা.) যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহর হারাম করা বস্তুর মতোই হারাম।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

শরীয়তের বিধান তিন প্রকার : স্বয়ং কোরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰي اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحي অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোনো কথা স্বীয় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতিহাদ ও ওহীর মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়।

সারকথা এই যে রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন সেগুলো তিন প্রকার : (এক), যেসব বিধান কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। (দুই), যেসব বিধান সুস্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লিখিত নেই, বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (তিন), যেসব বিধান তিনি স্বীয় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন, অতঃপর এর বিরুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি।

উপরোক্ত তিন প্রকার বিধানই অবশ্য পালনীয় এবং وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই আলোচ্য আয়াতে কোরআনের সংক্ষিপ্ত নামের পরিবর্তে وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ দীর্ঘ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআনে যা স্পষ্টত উল্লিখিত আছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) যা দিয়েছেন, সবই অপরিহার্য ও অবশ্য পালনীয় বিধান।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে এতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন–এ তিনটি গ্রন্থের নির্দেশনাবলি পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে। ইঞ্জিল তাওরাতের কোনো কোনো বিধানকে এবং কোরআন তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিধানকে রহিত করেছে। এমতাবস্থায় তিনটির সমষ্টিকে পালন করা কিভাবে সম্ভবপর হবে?

এর জবাব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ পরবর্তীকালে আগমনকারীগ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থের যেসব বিধানকে পরিবর্তন করেছে, সেসব পরিবর্তিত বিধান পালন করাই উভয় গ্রন্থ পালন করার নামান্তর। রহিত বিধান পালন করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি একটি সান্ত্বনা : উপসংহারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে, আহলে কিতাবদের অনেকেই আমার দেওয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা উপকৃত হবে না। বরং তাদের কুফর ও ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যাবে। অতএব আপনি এতে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না।

চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি ঈমান, সৎকর্মের আহ্বান এবং পরকালের মুক্তির ওয়াদা : দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সে জন্য পরকালের মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ মুসলমান, দ্বিতীয়ত اَلَّذِيْنَ هَادُوْا অর্থাৎ ইহুদি, তৃতীয়ত صَابِئُوْنَ এবং চতুর্থত نَصَارٰي এদের মধ্যে তিনটি জাতি–মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টান সর্বজন পরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। সবিয়ূন অথবা সাবেয়া নামে আজকাল পৃথিবীতে কোনো প্রসিদ্ধ জাতি নেই। এ কারণেই এদের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর হযরত কাতাদা (রা.)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে সবিয়ূন হলো তারা, যারা ফেরেশতাদের ইবাদত করে, কিবলার উল্টো দিকে নামায পড়ে এবং দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ যবুর পাঠ করে।

কোরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যত এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কোরআন মজীদে চারটি ঐশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে, কোরআন, ইঞ্জিল, যবুর ও তাওরাত। আয়াতে এই গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুর একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহকারে সূরা বাকারার সপ্তম রুকুতে বর্ণিত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰي وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ -

এতে সহজবোধ্যতার কারণে কিছু শব্দকে আগে-পিছে করা হয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই।

আল্লাহ তা'আলার কাছে সাফল্য সৎকর্মের ওপর নির্ভরশীল : উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে আমার দরবারে কারো বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোনো মূল্য নেই।

যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যা-ই থাক আমার কাছে প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলেও এরই নির্দেশ রয়েছে এবং কোরআন পাক শুধু এ উদ্দেশেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কোরআন অবতরণ ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পর কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুরের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে এসব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা মুসলমান হবে, তারা পরকালে মুক্তি ও সাওয়াবের অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন হয়েছে যে এরা কুফর ও পাপের পথ থেকে এযাবৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে, মুসলমান হওয়ার পর এদের পরিণাম কী হবে? আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে অতীত সব গোনাহ ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শঙ্কিত ও দুঃখিত হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ করলে বাহ্যত বোঝা যায় যে এখানে মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ স্তরের প্রতি যাদের ডাকা উদ্দেশ্য আয়াতে শুধু তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে। কোনো শসনকর্তা অথবা বাদশাহ এরূপ স্থলে বলে থাকেন, আমাদের আইন সবার বেলায় প্রয়োজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী, যে-ই আনুগত্য করবে, সে-ই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই জানা যে অনুগতরা তো আনুগত্য করছে। যে বিরোধী আসলে তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে অনুগতদের প্রতি আমার যে কৃপাদৃষ্টি তা কোনো বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের আনুগত্যের ওপরই নির্ভরশীল। যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ কৃপা-অনুগ্রহের অধিকারী হবে।

উপরিউক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অংশ তিনটি : আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্ম।

রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই : এ আয়াতে ঈমান-বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। এ আয়াত সে ক্ষেত্রও নয় ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তৎপ্রতি আহ্বান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এ ক্ষেত্রেও রাসূল অথবা রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুষ্ঠুরূপে উল্লিখিত না হওয়ার কোনো সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনোরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কোরআন ও তার শত শত আয়াতে রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে রাসূল ও রাসূলের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোনো ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোনো না কোনো উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কোরআনে অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রিসালত উল্লিখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে প্রত্যেক বিজ্ঞ ইহুদি, খ্রিস্টান এমনকি মূর্তিপূজারী হিন্দু থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে পরলৌকিক মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা কোনো জরুরি বিষয় নয়। (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে কোরআন পাঠের শক্তি এবং কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান দান করেছেন তাদের পক্ষে কোরআনের স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ বিভ্রান্তি দূর করতে খুব বেশি বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। যারা কোরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লিখিত হলো।

ঈমানে মুফাসসালের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাকারার শেষভাগে কোরআনের ভাষা এরূপ :

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

সবাই বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا "আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি শরীয়ত ও বিশেষ পথ নির্ধারণ করেছি।"

এরপর এর কি বৈধতা থাকে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ রিসালত ও কোরআনে অবিশ্বাসী ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য জাতির সাথে শুধু প্রচারযুদ্ধই করেননি বরং তরবারির যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছেন। ঈমানদার ও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য যদি শুধু আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট হতো, তবে বেচারা ইবলিশ কোন পাপে বিতাড়িত হলো? আল্লাহর প্রতি কি তার বিশ্বাস ছিল না, কিংবা সে কি পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিল? সে তো ক্রোধান্বিত অবস্থায় اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত) বলে পরকালে বিশ্বাসী হওয়ার স্বীকারোক্তি করেছিল।

বাস্তব সত্য এই যে এ বিভ্রান্তিটি হচ্ছে, ওই সব লোকের ভ্রান্ত মতবাদের ফসল, যারা মনে করে যে দ্বীন বিজাতিকে উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে বিজাতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অথচ কোরআন পাক খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, অমুসলমানদের সাথে উদারতা, সহানুভূতি, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, মানবতা ইত্যাদি সব কিছুই করা দরকার, কিন্তু ধর্মের চতুঃসীমার পুরোপুরি সংরক্ষণ এবং এর সীমান্তের দেখাশোনার দায়িত্ব উপেক্ষা করে নয়।

কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে যদি ধরে নেওয়া যায় যে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস একেবারেই উল্লেখ করা না হতো, তবুও অন্য যেসব আয়াতে বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে সে আয়াতগুলোই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে স্বয়ং এই আয়াতেও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ কোরআনের পরিভাষায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বললে সে বিশ্বাসই ধরতে হবে, যাতে আল্লাহর নির্দেশিত সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। কোরআনের এ পরিভাষা নিম্নোক্ত বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে, فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাস যেরূপ ছিল, একমাত্র সেরূপ বিশ্বাসই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নামে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাসের বড় স্তম্ভই যে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ছিল–এ কথা কারো অজানা নয়। তাই مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শব্দের মধ্যে রাসূলের প্রতি বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পয়গম্বরগণের প্রতি–এভাবে যে তাঁর পয়গম্বদের মধ্যে আমরা কোনোরূপ পার্থক্য করি না।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে ঈমানের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে এ কথাও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে কোনো একজন অথবা কয়েকজন পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কখনো মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং সমস্ত পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই শর্ত। যদি একজন রাসূলও বিশ্বাস থেকে বাদ পড়েন, তবে এরূপ ঈমান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا

"যারা আল্লাহ এবং রাসূলদের অস্বীকার করে, আল্লাহ এবং রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় (অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না) এবং যারা ইসলাম ও কুফরের মধ্যে অন্য কোনো রাস্তা করে নিতে চায় তবে বুঝে নাও যে তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফের।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, لو كان موسي حيا لما وسعه الا اتباعي অর্থাৎ "আজ মূসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।"

অতএব প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে–এরূপ বলা কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ নয় কি?

এ ছাড়া যেকোনো যুগে যেকোনো ধর্ম পালন করাই যদি মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে শেষ নবী (সা.)-এর আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণ এবং এক শরীয়তের পর অন্য শরীয়ত প্রেরণ করা অর্থহীন। প্রথম রাসূল যে শরীয়ত ও যে গ্রন্থ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাই যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য রাসূল ও গ্রন্থ প্রেরণের কী প্রয়োজন ছিল? বড়জোর এমন একদল লোক থাকাই যথেষ্ট হতো, যারা সেই শরীয়ত ও গ্রন্থের হেফাজত করতেন এবং তা পালন করতে ও করাতে সচেষ্ট হতেন, সাধারণভাবে যা প্রত্যেক উম্মতের আলেমরা করে থাকেন।

এমতাবস্থায় কোরআন পাকের এ উক্তির কী মানে হয় যে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

মুসলিম দুনিয়ায় সর্বাধিক পঠিত অন্যতম কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৭৭

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক 'আল-আবরার'। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।
হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে দরূদে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দু ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে দরূদ :

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীস নং-০১ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، قَالَا :ثَنَا السَّرِيُّ، عَنْ خُزَيْمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :احْضَرُوا الْمِنبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِينَ ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ :آمِينَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ :آمِينَ ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا :يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ " :إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَضَ لِي فَقَالَ :بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ قُلْتُ :آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ :آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ :بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ :آمِينَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

হযরত কা'আব ইবনে আজরা (রা.) বলেন, একদিন নবীজি (সা.) আমাদের ইরশাদ করলেন, তোমরা মিম্বারের নিকটবর্তী হও। আমরা সকলে মিম্বারের কাছে পৌঁছে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলেন, বলে উঠলেন আমীন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন, বললেন, আমীন। আবার যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন, বললেন আমীন। খোতবা শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিচে অবতরণ করলেন তখন আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আজ আপনার জবানে এমন কিছু শুনলাম, যা ইতিপূর্বে আমরা আর কখনো শুনিনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার নিকট হযরত জিবরাইল (আ.) তাশরীফ এনেছিলেন। আমি যখন মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করি তখন জিবরাইল (আ.) বললেন, যে ব্যক্তি রমজান মাস পেল অথচ গোনাহ মাফ হলো না সে ধ্বংস হয়ে যাক। শুনে আমি বললাম আমীন। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি কবুল করো। অতঃপর আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম তখন জিবরাইল (আ.) বললেন, যার নিকট আপনার মোবারক নাম উচ্চারণ করা হয় আর সে আপনার ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না সে ধ্বংস হয়ে যাক। উত্তরে আমি বললাম আমীন। তারপর যখন আমি তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম জিবরাইল (আ.) বললেন, যে ব্যক্তির তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তন্মধ্যে একজনকে বার্ধক্যে পেল অথচ তারা তাকে বেহেশতে পৌঁছাতে পারল না সেও ধ্বংস হয়ে যাক। শুনে আমি বললাম আমীন।

(মুসতাদরাকে হাকেম ৪/১৫৪ হা. ৭২৫৬, আল কওলুল বাদী, পৃ. ২০৭)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক. হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরেস হতেও ঠিক এই রূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِث عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنبَرَ

فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً أُخْرَى فقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فقَالَ آمِينَ ثُمَّ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِينَ قَالَ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِينَ فقَالَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمين

(সহীহে ইবনে হিব্বান ২/১১৪, হা. ৪০৯, আল কওলুল বাদী, ২০৮)

হাদীসটির মান : সহীহ

হযরত জাবের (রা.), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আবু যর প্রমুখ থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যেমন :

খ.

وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :ارْتَقَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَلَى دَرَجَةٍ مِنَ الْمِنبَرِ فَقَالَ :آمِينَ، ثُمَّ ارْتَقَى دَرَجَةً أُخْرَى فَقَالَ آمِينَ، ثُمَّ ارْتَقَى الثَّالِثة فَقَالَ : آمِينَ، ثُمَّ جَلَسَ قَالَ :فَسَأَلُوهُ :عَلامَ أَمَّنْتَ يَا رَسولَ اللهِ؟ قَالَ :أَتَانِي جِبْرِيلُ فقال :رغم أنف امرىء ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ :آمين وَرَغِمَ أَنْفُ امْرِءٍ أَدْرَكَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ، أَوْ كِلاهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ .قُلْتُ :آمِينَ .وَرَغِمَ أنف امرىء أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ .قُلْتُ :آمِينَ.

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১৬৬, হা. ১৭৩১৬)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

গ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ عِصَامِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ابْنُ شَيْبَةَ خَيْرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيَ الْمِنبَرَ، فَلَمَّا رَقِيَ الدَّرَجَةَ الْأُولَى قَالَ : آمِينَ ، ثُمَّ رَقِيَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ :آمِينَ ، ثُمَّ رَقِيَ الثَّالِثَةَ فقَالَ: آمِينَ ، فقَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ :آمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ " :لَمَّا رَقِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى جَاءَنِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ :آمِينَ .ثُمَّ قَالَ :شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ :آمِينَ. ثُمَّ قَالَ :شَقِيَ عَبْدٌ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ : آمِينَ

(আদাবে মুফরাদ [বোখারী], পৃ. ৬৪৪)

হাদীসটির মান : হাসান

ঘ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ :نا سَلَمَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّهَاوِيُّ ، قَالَ :نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنبَرَ، فَقَالَ :آمِينَ آمِينَ آمِينَ ، فَلَمَّا نَزَلَ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ " :أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ أَوْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ :آمِينَ، فَقُلْتُ :آمِينَ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ أَوْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ :آمِينَ، قُلْتُ :آمِينَ، وَرَجُلٌ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ : آمِينَ، فَقُلْتُ :آمِينَ

(মুসনাদে বাজ্জার ৪/২৪০, হা. ১৪০৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৬৫)

হাদীসটির মান : হাসান

ঙ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا أَبُو الدَّرْدَاءِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُنِيبِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ارْتَقَى عَلَى الْمِنبَرِ فَأَمَّنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ :تَدْرُونَ لِمَ أَمَّنْتُ؟ قَالُوا :اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .قَالَ " :جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخْبَرَنِي :أَنَّهُ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ دَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ، فَقُلْتُ :آمِينَ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَلَمْ يَبَرَّهُمَا دَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ، فَقُلْتُ :آمِينَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ دَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ، فَقُلْتُ :آمِينَ

(আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী] ১২/৮৩, হা. ১২৫৫১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১৬৫, হা. ১৭৩১২, হা. ১৭৩১২)

হাদীসটির মান : হাসান

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী

আমি অধম আবরারুল হক (উফিয়া আনহু) হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর অসিয়তসমূহ 'আশরাফুস সাওয়ানেহ' কিতাবে দেখেছি। কয়েকজন বন্ধুকে শোনালাম। তাঁরা খুব প্রভাবিত হলেন। এ জন্য খেয়াল হলো সেটার নির্বাচিত অংশ চয়ন করে প্রকাশ করব, যাতে সবাই সেটার মাধ্যমে সহজে উপকৃত হতে পারে।

ফলশ্রুতিতে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর মূল ইবারত অক্ষুণ্ন রেখে কিছু নসিহত এবং অসিয়ত একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। যারা এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন, তাঁরা এ অধমকেও নেক দু'আয় স্মরণ রাখবেন।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর কিছু অসিয়ত ও পরামর্শ :

(ক)

আমি বিশেষভাবে আমার ভক্তবৃন্দকে এবং ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানকে খুব তাকীদের সাথে বলছি, ইলমে দ্বীন নিজে শিখা এবং সন্তানদের শেখানো প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফরযে আইন। সেটা চাই কিতাবের মাধ্যমে হোক অথবা সাহচর্যের মাধ্যমে। এ ছাড়া দ্বীনি ফেতনাসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। যেসব ফেতনার আধিক্য বর্তমানকালে খুব বেশি। এ ব্যাপারে কখনো উদাসিনতা ও ত্রুটি করবেন না।

(খ)

তালিবে ইলমদের অসিয়ত করছি, তাঁরা যেন নিছক দরস ও তাদরীসকে (পড়া ও পড়ানো) যথেষ্ট মনে না করেন। এগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করে আল্লাহওয়ালাদের খিদমত, সোহবত ও নেক নজরের ওপর। এ ব্যাপারে খুব পাবন্দির সাথে যত্নবান থাকবেন।

بے عنایت حق و خاصان حق۔
گر ملک باشد سیہ ہستش ورق

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত ও বুজুর্গানে দ্বীনের নেক নজর ব্যতীত যদি কেউ ফেরেশতাও বনে যায় তবুও তার আমলনামা কালো হবে।

(গ)

দ্বীনি বা দুনিয়াবী বিভিন্ন ক্ষতির প্রতি লক্ষ করে এসব ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছি।

১. কুপ্রবৃত্তি ও গোস্বার চাহিদা অনুযায়ী আমল করবেন না।

২. যেকোনো ব্যাপারে তাড়াহুড়া অত্যন্ত মন্দকাজ।

৩. পরামর্শ ব্যতীত কোনো কাজ করবেন না।

৪. অধিক কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা, যদিও সেটি মুবাহ কথাই হোক।

আর অতীব প্রয়োজন ও কাঙ্ক্ষিত বিশেষ লাভ ব্যতীত মানুষের সাথে অধিক মেলামেশা, বিশেষত যখন সেটা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যায় কিংবা আরো গভীর হয়ে গোপন কথা বলা শুরু হয়, সেটা খুব মারাত্মক ক্ষতিকর জিনিস।

৬. পূর্ণ আগ্রহ ছাড়া খানা খাবেন না।

৭. প্রচণ্ড চাহিদা ব্যতীত স্ত্রী সহবাস করবেন না।

৮. কঠিন প্রয়োজন ব্যতিরেকে ঋণ গ্রহণ করবেন না।

৯. অপব্যয়ের কাছেও যাবেন না।

১০. অপ্রয়োজনীয় সামানা জমা করবেন না।

১১. রুক্ষ মেজাজ ও রূঢ় আচরণকে স্বীয় অভ্যাস বানাবেন না। নম্রতা ও সহিষ্ণুতাকে নিজ প্রতীক বানাবেন।

১২. রিয়া ও লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকবেন। কথা, কাজে এবং খানা, পোশাকেও।

১৩. অনুসরণীয় ব্যক্তিদের উচিত, পয়সাওয়ালাদের সাথে খারাপ আচরণ না করা, আবার বেশি মেলামেশাও না করা। বিশেষত পার্থিব লাভ অর্জনের নিমিত্তে তাদেরকে যথাসম্ভব মাকসুদ বানাবেন না।

১৪. মুআমালা বা লেনদেন পরিষ্কার রাখাকে ইবাদত-বন্দেগির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন।

১৫. বর্ণনাসমূহ ও ঘটনাবলিতে সীমাহীন সতর্কতা অবলম্বন করবেন। এ ব্যাপারে বড় বড় দ্বীনদার ও বুদ্ধিমান মানুষও সতর্কতা অবলম্বন করেন না, চাই বোঝার ক্ষেত্রে অথবা নকল করার ক্ষেত্রে।

১৬. পারদর্শী স্নেহপরায়ণ ডাক্তারের অনুমতি ব্যতীত কখনো কোনো ধরনের ওষুধ ব্যবহার করবেন না।

১৭. জবানকে সর্বপ্রকার গোনাহ এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে চরম পর্যায়ে সাবধানে রাখবেন।

১৮. হকের পক্ষে থাকবেন। নিজ কথার ওপর জমে থাকবেন না।

১৯. মানুষের সাথে সম্পর্ক বাড়াবেন না।

২০. কারো দুনিয়াবী ব্যাপারে নাক

গলাবেন না।

(ঘ)

আমি আমার সাথে সম্পৃক্ত সকলের নিকট দরখাস্ত করছি, প্রত্যেকে জীবনভর মনে করে প্রত্যেহ সূরা ইয়াসীন পাঠ করে আমার নামে বখশে দেবেন। কিন্তু অন্য কোনো সুন্নাত পরিপন্থী কাজ, সাধারণ মানুষ বা বিশেষ মানুষের মত বিদ'আত করবেন না।

(ঙ)

যথাসম্ভব দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে অবস্থিত জিনিসের সাথে দিল লাগাবেন না। আর কোনো সময় আখেরাতের চিন্তা থেকে গাফেল হবেন না। সব সময় এমন অবস্থায় থাকবেন যেন যেকোনো সময় মৃত্যুর পয়গাম এলে নতুন কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন না পড়ে। এ কথা বলতে না হয়,

لَوْ لَا اَخَّرْتَنِيْ اِلي اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصدق

وَاَكُن مِّنَ الصَّالِحِيْنَ

এবং সর্বদা এটা মনে করবেন।

شاید ہمیں نفس واپسیں بود

অর্থাৎ সম্ভবত এই বুঝি আমার ডাক এলো।

আর সব সময় দিনের গোনাহসমূহ হতে রাতের পূর্বে আর রাতের গোনাহসমূহ হতে দিনের পূর্বে ইস্তিগফার করতে থাকবেন এবং যথাসম্ভব "হুকূকুল ইবাদ" বা মানুষের হকসমূহ থেকে দায়িত্বমুক্ত থাকবেন।

(চ)

ঈমানের সাথে মৃত্যু নসিব হওয়াকে সমস্ত নিয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণতম বলে বিশ্বাস রাখবেন এবং সব সময় বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে খুব কাকুতি-মিনতি ও অনুনয়-বিনয়ের সাথে এর জন্য দু'আ করবেন। আর বর্তমান ঈমানের ওপরে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন। আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার অনুযায়ী,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

"যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো তবে আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে আরো বেশি দান করব।" (সূরা ইবরাহীম : ৭)

এটাও "খাতামা বিল খায়র" বা ঈমানের সাথে মৃত্যু নসিব হওয়ার উপকরণসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান উপকরণ।

আর এরই সাথে আমি আমার জন্যও এ দু'আর দরখাস্ত করে বক্ষ্যমাণ আলোচনা শেষ করছি। যেন মহান আল্লাহ আমাকেও ঈমানের ওপর মৃত্যু দান করেন। আমীন। (আশরাফুস সাওয়ানেহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ : ১১৪-১১৫)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156
ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent
হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্প খরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।
Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

ইসলামে নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলদের জরুরি গুণাগুণ-৭

১৪ : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা :

যেকোনো দায়িত্বশীলের কাছে ক্ষমা করার গুণ থাকতে হবে পুরোদমে। নিজের যত প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা আর শক্তি থাক না কেন, অধীনদের ক্ষমা করার পবিত্র গুণ বলবৎ থাকা আবশ্যক। যা সব মানুষের জন্যই মহৎ গুণ। তবে দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে এই গুণের উপস্থিতি আবশ্যক।

ক্ষমার সংজ্ঞা :

ইমাম রাগেব আসফাহানী (রহ.) (মৃত্যু : ৫০২ হি.) লেখেন :

العفو ترك المؤاخذة بالذنب

“অপরাধীকে শাস্তি না দেওয়াই হলো ক্ষমা করা।” (আয-যারীয়াহ ইলা মাকারিমিশ শরীয়াহ্. পৃ. ২৩৪)

ক্ষমা করা একটি বুনিয়াদী মহৎ গুণ, যা রাষ্ট্রীয় তারাক্কী ও ক্ষমতা সুদৃঢ় রাখতে খুবই ফলদায়ক একটি পদক্ষেপ। রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য অত্যাবশকীয় একটি গুণ। কোরআনে কারীমের বহু আয়াত দ্বারা ক্ষমা করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝে আসে।

ইমাম কালঈ (রহ.) (মৃত্যু : ৬৩০ হি. বলেন :

اعلم ان الحلم محمود فى محله، والعفو مستحسن اذا استعمل مع اهله قال الله تعالى وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

“জেনে রাখো! হিলম (প্রজ্ঞা) তার স্বস্থানে প্রশংসনীয় এবং ক্ষমাযোগ্য লোককে ক্ষমা করে দেওয়া খুবই ভালো কাজ। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

“আর তোমরা যদি ক্ষমা করো, তবে তা হবে পরহেজগারীর নিকটবর্তী।” (আল-বাকারা : ২৩৭) (তাহযীবুর রিয়াসা : ৩০১)

অন্যত্র আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন :

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই ভালোবাসেন।” (আল-ইমরান : ১৩৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ ফরমান :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন।” (আল-মায়িদাহ : ১৩)

অন্যত্র ইরশাদ ফরমান :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাকো।” (আল-আরাফ : ১৯৯)

রাসূল (সা.)-এর বহু কওলী ও আমলী হাদীস দ্বারা ক্ষমা করার গুরুত্ব ও ফজীলত প্রমাণিত হয়।

হাদীস শরীফে এসেছে :

احسنوا اذا وليتم واعفوا عماملكتم

“যখন তোমাদের ওপর কোনো জিম্মাদারি অর্পিত হবে, তখন ইহসান করো এবং তোমাদের অধীনদের ক্ষমা করো।” (কানযুল উম্মাল : ৬/৬ (১৪৫০)

হাদীসে কুদসীতে এসেছে :

ان نبى الله موسىٰ قال يارب! اى عبادك اعزعليك؟ قال الذى اذا قدر عفا

“জলীলুল কদর পয়গাম্বার হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আপনার নিকট কোন বান্দা সবচেয়ে প্রিয়? আল্লাহ তা’আলা বললেন, ওই বান্দা, যে শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। বরং ক্ষমা করে দেয়।” (মিনহাজুস সালেহীন : ৯২৮)

আরেক হাদীসে এসেছে :

العفو لايزيد العبد الاعزاء، فاعفوا يعزكم الله

“ক্ষমা করার দ্বারা মানুষের ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধি পায়। অতএব তোমরা ক্ষমা করো; আল্লাহ তা’আলা তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন।” (কানযুল উম্মাল : ৩/৩৭৫ (৭০১২)

অন্যত্র এসেছে :

من عفى عند قدرة عفى الله عنه يوم العثرة

“যে শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিল, আল্লাহ তা’আলা তাকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করে দেবেন।”(কানযুল উম্মাল : ৩/৩৭৭ (৭০১২)

অন্যত্র ইরশাদ ফরমান :

العفو احق ما عمل به

“ক্ষমা করা এমন একটি মহৎ গুণ বিশিষ্ট আমল, যা আমলযোগ্য সকল আমলের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম একটি আমল। (কানযুল উম্মাল : ৩/৩৭৩ (৭০০৩)

হাদীস শরীফে এসেছে :

যখন গওরস বিন হারেস মুসলমানদের

পক্ষ থেকে গাফিলতি দেখতে পেল তখন সে এই সুযোগে রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে তরবারি কোষমুক্ত করে বলল,
"তুমি কি আমাকে ভয় পাও?"
প্রতি-উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন,
"মোটেই না।" সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল : "এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?" প্রতি-উত্তরে রাসূল (সা.)
বললেন : "আমার আল্লাহ!" এ কথা বলামাত্রই সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল এবং তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। রাসূল (সা.) তরবারি উঠিয়ে বললেন : "এবার তুমি বলো এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?" প্রতি-উত্তরে সে বলল : "আপনি সর্বোত্তম ভালো
আচরণকারী। রাসূল (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করব না, তবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সামনে কখনো
আপনার সাথে যুদ্ধ করব না এবং আপনার মোকাবেলায় যারা যুদ্ধ করে তাদের সহযোগিতাও করব না। রাসূল (সা.) তাকে ছেড়ে দিলেন। তখন সে তার সাথিদের কাছে এসে বলল : আজ আমি তোমাদের কাছে মানুষের মধ্য হতে সর্বোত্তম মানুষের কাছ থেকে ফিরে এসেছি।
(সহীহ ইবনে হিব্বান ৭/১৩৮
(২৮৮৩), মুসতাদরাকে হাকীম :
৩/৩১ (৪৩২২), মুসনাদে আবি ই'লা ৩/৩১৩ (১৭৮৭)
আরেক হাদীসে এসেছে :

عفو الملوك ابقى للملك

"একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য ক্ষমা করার গুণ তার রাজত্ব সুদৃঢ় ও দীর্ঘায়ু হওয়ার জন্য খুবই জরুরি।" (কানযুল উম্মাল : ৬/৪৭ (১৪৭৮)

খোলাফায়ে রাশেদীনদের দৃষ্টিতে ক্ষমা :

খোলাফায়ে রাশেদীনের উক্তি ও আমল দ্বারা ক্ষমা করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়। এ মর্মে খোলাফায়ে রাশেদীনের কয়েকটি উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

হযরত উমর (রা.)-এর উক্তি :

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) বলেন
১.

افضل العفو عند القدرة

"সর্বোত্তম ক্ষমা হলো সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়া।" (আল-মানহাযুস সূলুক : পৃ. ৩১৭)
২.

احلم الناس من عفى بعد القدرة

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও সহানুভূতিশীল সেই ব্যক্তি যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।" (মউসুআতু আসারিস সাহাবা : ১/২৩ (৫০৫)
৩.

اذا حضرتمونا فاسئلوا فى العفو جهدكم، فانى ان اخطئ فى العفو احب الى من ان اخطئ فى العقوبة

"যখন তোমরা আমার সামনে আসবে তখন খুব কৌশল অবলম্বন করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কেননা আমি যদি ভুলবশত ক্ষমা করে দিই তাহলে তা ভুলক্রমে শাস্তি দেওয়া অপেক্ষা উত্তম হবে।" (কানযুল উম্মাল : ৩/৭৩৫
(৮৬১০, মাউসুআতু আসারিস সাহাবা : ১/১৩৬(৬৫১)

হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর উক্তি :

তিনি বলেন :

ان اولى الناس بالعفو: اقدرهم على العقوبة، وان انقص الناس عقلا: من ظلم من هودونه

"মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দেয় এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ ওই ব্যক্তি, যে তার চেয়ে নীচের স্তরের লোকদের ওপর জুলুম করে।" (আল-মানহাযুল মাসলুক পৃ.৩১৭, আলআকদুল ফরীদ ২/৯৪,
যাহরুল আদাব : ১/৫৩)
তিনি বলেন :

انى لانف ان يكون فى الارض جهل لايسعه حلمى، وذنب لايسعه عفوى، وحاجة لايسعها جودى۔

"আমি এটা পছন্দ করি না যে, জমিনে এত বেশি পরিমাণ অজ্ঞতা ছড়িয়ে যাক, যা আমার জ্ঞান-গরিমার পরিধির বহির্ভূত হয় এবং জমিনে এমন কোনো অপরাধ হোক, যা আমার ক্ষমার বাইরে হবে।
আর আমি এটাও পছন্দ করি না যে, পৃথিবীর মানুষ এমন কোনো
হাজত-প্রয়োজনের সম্মুখীন হবে, যা আমার দানশীলতা পূরণ করতে অক্ষম হবে।" (তাহযীবুর রিয়াসা, পৃ. ২০২)

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.)-এর উক্তি :

উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.) বলেন :

احب الامور الى الله ثلاثة: العفو فى القدرة، والقصد فى الجدة، والرفق فى العبادة، ومارفق احد باحد فى الدنيا الا رفق الله به يوم القيامة

"আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনটি কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয়।যথা : ১. শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া, ২. মেহনত ও চেষ্টায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা, ৩. সৃষ্টিকুলের সাথে নরম ব্যবহার করা। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারো সাথে নরম ও ভালো ব্যবহার করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে নরম ব্যবহার করবেন।"
(রওজাতুল উকালা, পৃ. ২৮১)

দায়িত্বশীল ও প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের জন্য ক্ষমার গুরুত্ব :

বিশেষত প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের জন্য

ক্ষমা করার মনমানসিকতা অনেক গুরুত্ব বহন করে।

আল্লামা শীযরী (রহ.) লেখেন :

اعلم ان وصف العفو خليق بالملك لمافيه فى المزية، وكمال مصلحة الرعية، لان الملك متى عاقب على الزلة، وقابل على العفوة، واخذ بالجرم الصغير، ولم يتجاوز عن الكبير قبحت سيرته، وفسدت سريرته

"একজন বাদশাহ ও বিচারপতির জন্য ক্ষমা ও সহনশীলতার গুণ থাকা অতীব জরুরি। কেননা এর দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া এতে প্রজাদেরও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যখন বাদশাহ কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেবে, তার ভুল ও পদস্খলনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং সাধারণ অপরাধের কারণে শাস্তি দেবে এবং বড় অপরাধীকে ক্ষমা করে দেবে, এতে তার আখলাক খারাপ হয়ে যাবে এবং তার বাতেন বরবাদ হয়ে যাবে।" (আর মানহাযুস সূলুক, পৃ. ৩১৬)

ইমাম ছা'লবী (রহ.) (মৃত্যু : ৪২৯ হি.) বলেন :

العفو من افضل الاخلاق، وللملوك الافاضل واعودها عليهم فى العاجل والآجل

"ক্ষমা করা সর্বোত্তম আখলাকের মধ্য হতে একটি। বিশেষত রাজা-বাদশাহ, বিচারপতিদের জন্য যা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতে কল্যাণ বয়ে আনে।" (আদাবুল মুলূক, পৃ. ৯৫)

বিচারপতি ও প্রধান দায়িত্ববানদের জন্য ক্ষমার উপকারিতা :

ইমাম শা'ফী (রহ.)-এর উক্তি :

১.

لما عفوت ولم احقد على احد
ارحت نفسى من هم العدوات

"যখনই আমি আমার শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়েছি, এবং তার সাথে কোনো প্রকার দুশমনি রাখিনি, তখনই আমার আত্মা দুশমনের পেরেশানি থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে।"

২.

انى احيى عدوى عند رؤيته
لادفع الشرعنى بالتحيات

যখনই আমার সামনে আমার কোনো শত্রু এসে যায় আমি তাকে সালাম দিই এবং সালামের মাধ্যমে আমি তার অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পাই।

৩.

واظهر البشر للانسان ابغضه
كما ان قد حشى قلبى محبات

আমি আমাকে আমার সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তির সামনে এমন হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় প্রকাশ করি, যেন তার জন্য আমার অন্তর মুহাব্বতে ভরপুর।

৪.

الناس داء، ودواء الناس قربهم
وفى اعتزالهم قطع المودات

মানুষ রোগে আক্রান্ত। তাদের রোগের ওষুধ হলো তাদের নৈকট্য। আর মানুষ থেকে দূরে থাকা ভালোবাসা কর্তন করার নামান্তর।

আল্লামা ছা'লবী উল্লেখ করেন :

ذلك ان الملك اذا تكرم بالعفو عن المذنبين من اصحابه وقواده ممن لم يقدحوا فى ملكه، ولم يتعرضوا لحرمه، ولم يقدموا على افشاء سره، اشتدت محبتهم له، وظهرت موالاتهم اياه، وازدادت شفقتهم عليه، فبذلوا الجهد فى مناصحته، والذب عن سلطانه وامتثال اوامره

"একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য ক্ষমার গুণ থাকাটা এ জন্য বেশি জরুরি যে যখন একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারপতি ক্ষমার গুণ দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করবে এবং স্বীয় অধীন অন্য কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ওই সকল কর্মকর্তার ভুলত্রুটির প্রতি দৃষ্টি নিবৃত রাখবেন, যারা তার দোষ অন্বেষণ ও সমালোচনায় লিপ্ত নয় এবং না তার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার মতো দুঃসাহস তারা করেছে–এমতাবস্থায় তাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে তাদের সম্প্রীতি ও সুবন্ধন তৈরিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। ফলে তারা রাষ্ট্রপ্রধানের হিতৈষী ও কল্যাণকামী হবে এবং তার জন্য আত্ম বলিদান দিতে সদা প্রস্তুত থাকবে। (আদাবুল মুলূক, পৃ. ৯৫)

ক্ষমা করার স্থান

উপযুক্ত স্থানে ক্ষমা করা উচিত, যেখানে ক্ষমা করার মাঝে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর যেখানে ক্ষমা না করার মাঝে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সেখানে ক্ষমা না করাই যথাযোগ্য।

ইমাম কালঈ (রহ.) (মৃত্যু : ৬৩০ হি.) উল্লেখ করেন :

قال بعض البلغاء: لايكن عفوك واعضائك سببا للجرأة عليك، وعلة الاساءة اليك، فان الناس صنفان: عاقل يكتفى بالعذل والتانيب، وجاهل يحوج الى الضرب والتاديب

"জ্ঞানীরা বলেন যে, কারো ভুল-ত্রুটির প্রতি তোমার ভ্রুক্ষেপ না করা ও তাকে ক্ষমা করা যেন তোমার জন্য কাল না হয়ে দাঁড়ায় যে পরবর্তীতে তার জন্য তোমাকে কষ্ট দেওয়ার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। কেননা মানুষ দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা : ১. জ্ঞানী ব্যক্তি, যার থেকে অপরাধ প্রকাশ হওয়ার পর তাকে শুধু নিন্দা জানানোই তার জন্য অনেক বড় শাস্তি হয়ে যায়। যা তার ব্যক্তিত্বের গোড়ায় কুঠারাঘাত করে।

২. মূর্খ ব্যক্তি, যাকে শুধু নিন্দা জানানোর দ্বারা সংশোধন হবে না বরং শাস্তি দিতে হবে। (তাহযীবুর রিয়াছাহ, পৃ. ২১৪)

মুতানাব্বী (মৃত্যু : ৩৫৪ হি.)-এর উক্তি : তিনি বলেন :

১.

اذا انت اکرمت الکریم ملکته
وان انت اکرمت اللئیم تمردا

যখন তুমি কোনো ভদ্র লোকের সম্মান করবে, তাহলে তুমি তার মালিক হয়ে গেলে। (সে গোলামের মতো তোমার আনুগত্য করবে) আর যদি তুমি কোনো অসভ্য লোককে সম্মান করো, তাহলে সে তোমার অবাধ্য হবে।

২.

ووضع الندی موضع السیف بالعلی
مضر کوضع السیف فی موضع الندی

যেখানে তলোয়ার ব্যবহার করা জরুরি, সেখানে যদি নম্রতা হয়ে যায়, তাহলে তা এমন হবে, যেমন নম্রতার স্থানে তলোয়ার ব্যবহার করলে হয়। (দেওয়ানে মুতানাব্বী, পৃ. ৩৯)

অন্য এক কবি বলেন :

যখন নম্রতার প্রত্যাশা করা হয়, তখন নম্রতার ক্ষেত্র তৈরি হয়, অপাত্রে নম্রতা দেখানো মূর্খতা। (তাহযীবুর রিয়াছা, পৃ. ১১৫)

ক্ষমা করার সীমারেখা :

ক্ষমা করা একজন বিচারকের জন্য খুবই জরুরি, তবে এর একটা সীমারেখা রয়েছে।

ইমাম রাগেব আসফাহানী (রহ.) লেখেন :

العفو انما یستحب فیما اذا کانت الاساء مخصوصة بالعافی کمن اخذ ماله، او شتم عرضه، فاما اذا کانت الاسائة عائدة بالضرر علی الشرع، او علی جماعة الناس فانه وان کان فیها ادنی شبهة فللسلطان العفو۔ لقوله علیه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات

"ক্ষমা করা ওই সময়ের জন্য মুস্তাহাব আমল যখন ক্ষমা করার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা কেবল ক্ষমাকারীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। (শরীয়ত ও অন্য লোকদের পর্যন্ত না পৌঁছায়) উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ আত্মসাৎ করেছে অথবা গালি দিয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান : "তোমরা যথাসম্ভব হদকে (শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) যদি তাতে সামান্য পরিমাণও সন্দেহ বাকি থাকে তাহলে তা প্রয়োগ করিও না।" (বায়হাক্বী সুনানে কুবরা : ৮/৩১ (১৫৭০০), কানযুল উম্মাল : ৫/৩০৯ (১২৯৫৭, ১২৯৭২)

فان لم تکن ذات شبهة فلیس عفو او لذلك قال الله تعالی: ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر۔

আর যদি সন্দেহের কোনো অবকাশ বাকি না থাকে, তাহলে বিচারকের জন্য ক্ষমা করার কোনো সুযোগ নেই। বরং শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করতেই হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো।" (আন নূর : ২) (আয যারীয়াহ ইলা মাকারিমিশ শরীয়াহ, পৃ. ১৭৯)

একজন বিচারকের জন্য ক্ষমা করা অবশ্যই একটি জরুরি গুণ। তবে যদি কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমা করার পরিবর্তে প্রতিশোধ বা শাস্তি দেওয়ার মধ্যে কল্যাণ ও ফায়দা নিহিত থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বা শাস্তি প্রদান করাই শ্রেয়।

আল্লামা কাদেরী (রহ.) লেখেন :

الانتقام یصیر مطلوبا فی موضعین: الاول ان یکون ترکه عجزا او مهانة، وذلك هو الذل الذی تأنف منه ذووالهمم العالیة، والثانی حیث یترتب علی العفو مفسدة تربی علی مصلحة شرعا او سیادة معتبرة، ومن امثلته عقاب من استخف السلطان۔

দুই স্থানে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জরুরি। এক. যে ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা দুর্বলতা ও লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ হয়। দুই. যেখানে ক্ষমা করার দরুন ফেতনা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। হতে পারে তা কোনো শরয়ী ফেতনা বা রাষ্ট্রীয় কোনো ফেতনা। যেমন-যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধানকে লাঞ্ছিত করার জন্য তার পেছনে লেগে পড়ে, তার ব্যাপারে প্রপাগান্ডা ছড়ায় সে ক্ষেত্রে তাকে শাস্তি প্রদান করাই শ্রেয়। এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা করা রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য হুমকি ও অকল্যাণকর। (আল-কেফায়াতুল ইদারিয়া ফিস সিয়াসাতিশ শরয়ীয়াহ, পৃ. ৭৮)

আল্লামা কাদেরী লেখেন :

الاصل هو العفو والسماح وعدم الانتقام یفضل فی بعض الحالات ولبعض الناس الانتقام والتادیب بدل العفو اذا کانت مصلحة الانتقام، والتادیب راجحة، کان یکون الباغی مجاهرا بالمعصیة مصرا علی الاعتداء

আসল কথা হলো : ক্ষেত্র বিশেষ ও ব্যক্তি বিশেষ কোথাও ক্ষমার ঘোষণা করতে হবে আবার কোথাও প্রতিশোধ বা শাস্তি প্রদান করতে হবে। কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করা বা তাকে শাসানো ক্ষমা করা অপেক্ষা তার জন্য বেশি কল্যাণ বয়ে আনে। যেমন রাষ্ট্রদ্রোহী যে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করাই শ্রেয়। (আল-কেফায়াতুল ইদারিয়া ফিস সিয়াসাতিশ শরয়ীয়াহ, পৃ. ৭৫)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

'দরকার মজবুত ঈমানের'

শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব (দা.বা.)

(বিগত ১০ ইং মুহাররম, ১৪৪৩ হিজরী মোতাবেক ২০/৮/২০২১ ইং তারিখে খিলগাঁও বাজার মসজিদে জুমার খুতবার পূর্বে প্রদত্ত বয়ান। খোদাঈ শক্তির ওপর ভরসা করে সহায়-সম্বলহীন মুমিনদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী জাগতিক শক্তিতে বলীয়ান বিশাল বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় কিভাব বিজয় অর্জন করেছে এবং একজন মুমিন হিসেবে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আমাদের করণীয় কী? কোরআন-হাদীস এবং ইতিহাসের আলোকে তা আলোচিত হয়েছে। বয়ানটি পাঠকের জন্য উপযোগী বিবেচনা করে 'আল আবরার'-এর পাঠকদের জন্য পেশ করা হলো।)

কারবালা : ইতিহাসের মর্মান্তিক অধ্যায়

বুজুর্গানে মুহতারাম! আজ মুহাররমের ১০ তারিখ। এই দিনটি অনেক মুবারক ও বরকতময় দিন। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটিয়েছেন। হযরত হুসাইন (রা.) এই দিনেই শাহাদাত বরণ করেছেন। হযরত হুসাইন (রা.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই দিনটিকে তাঁর শাহাদাতের জন্য নির্বাচন করেছেন। হযরত হযরত হুসাইন (রা.) কুফাবাসীর আনুগত্য প্রদর্শনের চিঠি পেয়ে দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে কুফার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। অনেকেই না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) প্রমুখ সাহাবীরা তাঁকে নিষেধ করে বলেছিলেন যে, 'আপনি কি এমন জাতির (কুফাবাসী) কাছে যাচ্ছেন, যারা আপনার পিতা [হযরত আলী (রা.)]-কে হত্যা করেছে এবং আপনার ভাই [হযরত হাসান (রা.)]-এর সাথে অসদাচরণ করেছে! তারা (কুফাবাসী) আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আপনি যাবেন না!' কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.) কারো পরামর্শ গ্রহণ করেননি। পরিস্থিতি যা-ই হোক, কুফায় যাওয়ার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

مهما يقضى الله من أمر يكن

আল্লাহ তা'আলা যা ফয়সালা করে রেখেছেন, তা হবেই!

অবশ্য তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাফর যখন তাঁর কুফা যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন, কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চাইলেন না, তখন হযরত হুসাইন (রা.) বাস্তব কারণ তাঁর নিকট ব্যক্ত করলেন যে 'আমি কেবল দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কুফায় যাচ্ছি। সেখানে মানুষ আমার সঙ্গ দেবে কি না–সে বিষয়ে আমার তেমন পেরেশানি নেই। আমি তো আমার নানা (রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্নে দেখেছি যে, তিনি আমাকে একটি বিষয়ের আদেশ করেছেন। আর আমি তা অবশ্যই পালন করব!' (সিয়ারু আলামিন্নুবালা; ৩/২৯৭)

অবশেষে কুফার পথে ফোরাত নদীর তীরে ইয়াজিদের বাহিনী কর্তৃক তিনি অবরুদ্ধ হন। তাঁকে সামনে বাড়তে দেওয়া হয়নি। একপর্যায়ে কুফার গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নির্দেশে ইয়াজিদ বাহিনী তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'তোমরা কুফাবাসী হাজার হাজার চিঠি পাঠিয়ে আমাকে আসার দাওয়াত দিয়েছো। এখন কেন আমাকে মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়েছো?' তারা সম্পূর্ণরূপে তা অস্বীকার করল। অবশেষে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। যুদ্ধে হযরত হুসাইন (রা.)-এর বাহিনীর সকল যোদ্ধা প্রাণপণ যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। এখন কেবল হুসাইন (রা.) একাই আছেন। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে একাই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। একপর্যায়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। তখন কেউ হুসাইন (রা.)-এর সামনে যাওয়ার দুঃসাহস করল না। কারণ, তিনি তো নবীজির নাতি ও কলিজার টুকরা! জান্নাতী যুবকদের সরদার! তাই কেউ স্বহস্তে বিপদ ডেকে আনা ভালো মনে

করল না। কিন্তু ‘শিমর বিন যিল জাওশান’ নামক *(এই নামটি দুভাবে উচ্চারণ করা যায়। এক. শিম্‌র বিন যিলজাওশান। দুই. শামির বিন যিলজাওশান। (সূত্র : আল-কামেলফিত- তারিখ, ১/৪৬৬, তারীখুলইসলাম, ৫/১০), অনেকে শিমার বলে থাকেন–এটা সঠিক উচ্চারণ নয়।)* এক হতভাগা কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তাঁকে হত্যা করল। হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে তাঁর পরিবার-পরিজনের অনেককেই শহীদ করা হয়েছে। অবশেষে তাঁর মাথা মুবারক ইয়াজিদের দরবারে উপস্থিত করা হয়। ইয়াজিদ রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে লোক দেখানোর জন্য কিছু কান্না করল এবং কুফার শাসক উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে তিরস্কার করে বলল, ‘আমি তো হযরত হুসাইনকে হত্যা করতে বলিনি, কেবল বাধা দিতে বলেছি।’ উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে মৌখিক কিছু তিরস্কার করলেও তাকে কোনো ধরনের শাস্তি সে দেয়নি। এমনকি শাসনক্ষমতা থেকেও অপসারণ করেনি।

কারবালার রণাঙ্গন : মুমিনের প্রেরণা ও চেতনার উৎস :

কারবালার এই ঘটনায় হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর সাথিবর্গসহ শাহাদাত বরণ করলেও প্রকৃত বিজয় তাঁদেরই ছিল। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ হযরত হুসাইন (রা.)-কে সম্মানের সাথে স্মরণ রাখবে। তাঁর এই চেতনাকে উজ্জীবিত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। পক্ষান্তরে ইয়াজিদকে মানুষ জালেম ও দুঃশাসক হিসেবে জানবে। তা ছাড়া এই ইয়াজিদ বাহিনীর ওপর তো আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছে। কিছুদিন পর কুফায় মুখতার ছাকাফী নামক এক ব্যক্তি শাসনক্ষমতা লাভ করলেন। তিনি তাঁর শাসনক্ষমতায় চিরুনি অভিযান চালিয়ে হুসাইন (রা.)-এর হত্যার সাথে জড়িত সকলকে নির্মমভাবে কতল করেছেন। এরপর তাদের মাথাগুলো কুফার জামে মসজিদের সামনে রেখে দিয়েছেন। সেখানে হযরত হুসাইন (রা.)-কে শহীদ করার নির্দেশদানকারী এবং তাঁর মাথা মোবারকের সাথে বেয়াদবিমূলক আচরণকারী কুফার শাসক উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের মাথাও ছিল। হঠাৎ দেখা গেল, সেখানে একটি সাপ এসে উবাদুল্লাহর কর্তিত মাথার নাক দিকে ঢুকল এবং মুখ দিয়ে বের হলো। (আল ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব; ১/৩৯৬-৩৯৭, সুনানে তিরমিযী; হা. নং ৩৭৮০) অপরদিকে ইয়াজিদও বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। এভাবে ইয়াজিদও শেষ হলো, তার বাহিনীও নিঃশেষ হয়ে গেল! তাদের একজনও দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ না করে ইন্তেকাল করেনি। এ যেন আল্লাহর কোরআনের এ বাণীর বাস্তব রূপ :

(وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ)

অর্থ : বড় শাস্তির পূর্বে আমি তাদেরকে (পৃথিবীতে) লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব। (সূরা সাজ্‌দাহ : ২১)

এখন আপনারাই বলুন, এখানে ইয়াজিদের বিজয় হয়েছে, না পরাজয় ঘটেছে? নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট পরাজয় ছিল। অপরদিকে হযরত হুসাইন (রা.)-এর এই দ্বীনি জযবা ও ধর্মীয় চেতনা আজও প্রতিটি মুসলমান আপন হৃদয়ে লালন করে। তা ছাড়া এই শাহাদাত লাভ করার দ্বারা হযরত হুসাইন (রা.) শহীদদের সরদার হওয়ার গৌরবও লাভ করলেন। সুতরাং বলতেই হবে, এখানে প্রকৃত বিজয় হযরত হুসাইন (রা.)-এর বাহিনীর ছিল।

কারবালার শিক্ষা ১ : সত্যের পথে অবিচলতা

কারবালার এই ঘটনায় শিক্ষণীয় একটি দিক হলো, এই যুদ্ধে ইয়াজিদের বাহিনীতে ছিল কয়েক হাজার সৈন্য। অপরদিকে হযরত হুসাইন (রা.)-এর বাহিনীতে মাত্র ৭২ জন্য লোক ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও হুসাইন (রা.) মিথ্যার সাথে আপস করেননি এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটেননি। এটা যেন ‘গর্দান দিতে রাজি, কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের পথ ছাড়তে রাজি না’-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কারবালার শিক্ষা ২ : শাহাদাত মৃত্যু ত্বরান্বিত করে না

হযরত হুসাইন (রা.)-কে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী অনেকেই কুফায় না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, ‘কুফাবাসী আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।’ কিন্তু হযরত হুসাইন (রা.) কারো পরামর্শ গ্রহণ করেননি। পরিস্থিতি যা-ই হোক, কুফায় যাওয়ার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। কারণ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শহীদ হতে পারা অনেক সৌভাগ্যের বিষয়। যে কারো ভাগ্যে শাহাদাতের এই সৌভাগ্য লেখা থাকে না। চাইলেই শহীদ হওয়া যায় না। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) জীবনে কত যুদ্ধই না করেছেন! তাঁর জীবনে বড় আশা ছিল শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা। শেষ দিকে তো শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় লোহার টুপি ও লোহার বর্ম ছাড়াই যুদ্ধে নেমে পড়তেন। শত্রু বাহিনীর কাতার ভেদ করে তাদের মাঝে ঢুকে যুদ্ধ করতেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য তাঁর কপালে লেখা ছিল না। তাই তিনি শাহাদাতের মৃত্যুর পরিবর্তে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন।

সুতরাং শাহাদাতের ভয়ে জিহাদ থেকে পিছপা হওয়া একজন মুমিন বান্দার জন্য কোনোভাবেই সমীচীন নয়। বরং চেষ্টা করেও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা যায় কি না, সেটি দেখার বিষয়।

কারো কারো মনে আসে, শহীদ হওয়ায় লোকটি অকালে মৃত্যুবরণ করল। আরো কিছুদিন লোকটি বাঁচত, কিন্তু যুদ্ধে শরীক হওয়ার দরুন তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে। এটা একদম বাজে কথা। যার মৃত্যু যে সময় লেখা তখনই হবে; এক সেকেন্ড আগেও হবে না, পরেও হবে না। তাই শহীদি মৃত্যু কখনো মৃত্যু ত্বরান্বিত করে না। বরং বুঝে নিতে হবে, পূর্বনির্ধারিত সময়েই তার মৃত্যু হয়েছে।

কেউ শহীদি মর্যাদা লাভ করতে পারলে তার বংশের লোকদের কপাল খুলে গেল। শহীদ ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে!

শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অনেক মর্যাদাশীল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার জীবনের কোনো হিসাব নেবেন না। বিনা হিসাবে তাকে জান্নাত দান করবেন। বাস্তব কথা হলো, হিসাব দিয়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। অবশ্য তার ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধযোগ্য সম্পদ রেখে যেতে হবে। তাই শাহাদাতের এই মর্যাদা থেকে পিছু না হটে আমৃত্যু এ মর্যাদা লাভের চেষ্টা করতে হবে।

কারবালার শিক্ষা ৩ : সংখ্যাধিক্যে নয়, বরং ঈমানী শক্তিতে নির্ভর করা

মুসলমান কখনো জড়বাদী শক্তির ওপর ভরসা করে না। মুসলমান তো খোদাঈ শক্তিতে শক্তিশালী ও বলীয়ান। এ কারণে হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর মুষ্টিমেয় সফরসঙ্গী নিয়ে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে ভয় পাননি। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর জমানায় রানি বিলকিসের একটি ভূখণ্ডে শাসনক্ষমতা ছিল। সুলাইমান (আ.) তাকে বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে বলেছিলেন। বিলকিস সুলাইমান (আ.)-এর সামনে লড়াই করে টিকতে পারবে না–এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, সে তার দলবলসহ সুলাইমান (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হবে। সুলাইমান (আ.) এ সংবাদ শুনে একটি হেকমতের প্রতি লক্ষ রেখে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন,

(أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ)

অর্থ : তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? (সূরা নামল : আয়াত ৩৮)

তখন এক শক্তিশালী জিন বলে উঠল–

(أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ)

অর্থ : আপনি আপনার স্থান (মজলিস) থেকে ওঠার পূর্বে ওটা আমি এনে দেব। (সূরা নামল : আয়াত ৩৯)

এই শক্তিশালী জিন জড়বাদী ও জাগতিক শক্তির ভিত্তিতে এই কথা বলেছে। ওই মজলিসে রূহানী শক্তিতে বলীয়ান ও আল্লাহর কিতাবের আলেম একজন লোক ছিলেন। তিনি বললেন–

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

অর্থ : আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দেব। (সূরা নামল : আয়াত ৪০)

সুলাইমান (আ.) তাঁকে হুকুম দিলে তিনি বাস্তবেই সিংহাসনটি চোখের পলকে এনে দেন। এতে সুলাইমান (আ.) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বললেন–

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ

অর্থ : এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করলেন যে, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ! (সূরা নামল : আয়াত ৪০) *(আমরা অনেকে বিল্ডিং ইত্যাদিতে লেখে রাখি* هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي *(এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে)। কিন্তু* لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ *(যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ)–এই অংশটি লেখি না। অথচ এই অংশটির শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের সঠিক পথ দেখাবে।)*

এই ঘটনায় আমাদের দেখার বিষয় হলো, জাগতিক ও জড়বাদী শক্তি কখনো রূহানী ও খোদাঈ শক্তির ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। আল্লাহর কিতাবের আলেমের জাগতিক শক্তি না থাকলেও রূহানী শক্তি ছিল। তাই তিনি সিংহাসনটি মুহূর্তের মধ্যেই উপস্থিত করলেন। পক্ষান্তরে শক্তিশালী জিনটির জড়বাদী শক্তি ছিল, রূহানী শক্তি ছিল না। তাই সে এত অল্প সময়ে কাজটি আঞ্জাম দিতে অক্ষম ছিল। আমার মূল কথা হলো, জড়বাদী ও জাগতিক শক্তিতে বিশ্বাসী না হয়ে একজন মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো যে, সে খোদাঈ শক্তিতে বিশ্বাসী ও বলীয়ান হবে।

তালুত ও জালুতের ঐতিহাসিক যুদ্ধ : ঈমানী শক্তির বিজয়

মুসলমান আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাসী, বস্তুবাদীতে নয়। খোদাঈ শক্তির সামনে কোনো শক্তিই টিকতে পারবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী বিশাল বিশাল বাহিনীর

মোকাবেলায় বিজয় লাভ করেছে। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

(كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)

অর্থ : এমন কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে! আর আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা ধৈর্যের পরিচয় দেয়। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জালুত ও তালুতের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তালুত ছিল আল্লাহর বাহিনী মুমিনদের প্রধান আর জালুত ছিল শয়তানের বাহিনী কাফেরদের প্রধান। আল্লাহর বাহিনীর সংখ্যা কেবল ৩১৩ জন ছিল। আর শয়তানের বাহিনীতে সৈন্য ছিল অসংখ্য-অগণিত! কিন্তু এই বিশাল শয়তানের বাহিনীর মোকাবেলায় আল্লাহর ক্ষুদ্র ও ছোট বাহিনী বিজয় লাভ করেছিল। তালুতের বাহিনীতেও অনেক সৈন্য ছিল। তালুত শর্ত করেছিলেন যে, 'পথিমধ্যে পড়া নদী থেকে কেউ যেন পানি পান না করে। যে পান করবে সে আমাদের সাথে যুদ্ধে শরীক হতে পারবে না।' মাঝপথে নদীর কাছে পৌঁছলে সকলে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। সহ্য করতে না পেরে অনেকেই পানি পান করে। কেবল ৩১৩ জন আত্মসংবরণ করতে সক্ষম হয়। ফলে এই ৩১৩ জনকে

নিয়েই তালুত অগ্রসর হন এবং আল্লাহর রহমতে বিজয়ও অর্জন করেন। এটাকেই কোরআনে এভাবে বলেছে,

'কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী বিশাল বিশাল বাহিনীর ওপর বিজয় অর্জন করেছে!' সুতরাং মুসলমান কখনো সংখ্যাধিক্যের ওপর ভরসা করে না। বরং যা আছে তা নিয়ে আল্লাহর হুকুমে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং খোদাঈ শক্তিতে বিজয়ও অর্জন করে। আরেক আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

(وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)

অর্থ : হে মুসলমানগণ! তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকো। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ১৩৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা সংখ্যায় কম হওয়ায় হীনবল হয়ো না এবং অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় চিন্তিত হয়ো না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হও। তোমরাই বিজয় হবে। তবে তিনি একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। বিজয় লাভ করার জন্য তোমাদের প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে।

ফেরাউনের মোকাবেলায় হযরত মুসা (আ.) : খোদাঈ নুসরতের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

খোদাঈ শক্তির সামনে কোনো শক্তিই টিকতে পারবে না। ইতিহাসে এর অসংখ্য উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। ফেরাউন তো মিসরে বনী ইসরাঈলকে ঝাড়ুদার ও মেথর বানিয়ে রেখেছিল। মুসা (আ.)-এর ভয়ে অসংখ্য শিশু হত্যা করেছিল। কিন্তু আল্লাহর কী

কুদরত, যে মুসাকে হত্যা করার জন্য তার এত আয়োজন সেই মুসা (আ.)-কে ফেরাউনের যেন খুবই 'প্রয়োজন'। তাই নিজ প্রাসাদে লালন-পালন করে বড় করল। একসময় মুসা (আ.) বড় হয়ে নবুওয়াত লাভ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মিসর ত্যাগ করে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে শামের অভিমুখী রওনা হওয়ার হুকুম দিলেন। বর্তমান সিরিয়া, জর্দান,

লেবাননসহ আশপাশের দেশগুলো তদানীন্তন কালের শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহর হুকুমে মুসা (আ.)

শামের উদ্দেশে রাত্রিবেলা যাত্রা আরম্ভ করলেন এবং লোহিত সাগরের তীরে এসে পৌঁছলেন। আল্লাহর আদেশে সাগরে লাঠির আঘাত করলে সাগরে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। তিনি তাঁর অনুসারী নিয়ে মাঝ সাগরে পৌঁছলে ফেরাউন তখন মাত্র সাগরে নামল। মুসা (আ.) সাগর পেরিয়ে রাস্তায় উঠলে ফেরাউন বাহিনী তখন মাঝ সাগরে। আল্লাহর হুকুমে মুসা (আ.) আবার সাগরে লাঠির আঘাত করলে সাগর পূর্বের ন্যায় পানিতে মিলিত হয়ে যায়। এতে ফেরাউন তার দলবলসহ পানিতে ডুবে মারা যায়।

এই ঘটনা থেকে আমি বোঝাতে চাচ্ছি, খোদাঈ শক্তির সামনে কোনো শক্তি টিকতে পারে না। মুসলমান জড়বাদী ও বস্তুবাদীতে বিশ্বাসী নয়, তারা আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাসী। আল্লাহর ইচ্ছা হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী বিশাল বিশাল বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করে। কোনো কোনো বর্ণনা মতে ফেরাউনের বাহিনী ছিল সাত লাখ। আর মুসা (আ.)-এর বাহিনীতে সে তুলনায় খুবই অল্পসংখ্যক লোক ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ.) কে বিজয় দান করেছেন। এই বিষয়টিকে কোরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে :

(كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)

অর্থ : এমন কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে! আর আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যাঁরা সবরের পরিচয়

দেন। (সূরা বাকারা; আয়াত ২৪৯)

বদরের যুদ্ধ : সহায়-সম্বলহীন বাহিনীর অলৌকিক বিজয়

নবীজির হিজরতের এক বছর পর কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেটা হলো বদর যুদ্ধ। মুসলমানদের মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য ছিল। অস্ত্রশস্ত্র তেমন ছিল না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে খেজুরের ডাল ভেঙে দিয়েছিলেন যুদ্ধ করতে। অপরদিকে কাফেররা এক হাজার বাহিনীর বিশাল সৈন্যদল ছিল। তাদের প্রত্যেকের ঘোড়া বা উট ছিল। তীর, তরবারি, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রের কোনো অভাব ছিল না তাদের। এতদ্বসত্ত্বেও খোদাঈ সাহায্যে মুসলমানদের বিজয় হলো। আবু জাহেলসহ কাফেরদের ৭০ জন নিহত হলো। অপর ৭০ জন বন্দি হলো। এটাই হলো খোদাঈ শক্তি।

(كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)

অর্থ : এমন কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে! আর আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যাঁরা সবরের পরিচয় দেন। (সূরা বাকারা; আয়াত ২৪৯)

মুতার যুদ্ধ : দুই লাখের মোকাবেলায় মাত্র তিন হাজারের বিজয়

একবার তো মাত্র তিন হাজার মুসলমান দুই লাখ খ্রিস্টানের সাথে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেছে। সেই যুদ্ধটি হলো মুতার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাহিনী পাঠানোর সময় নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন জন সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। একজন শাহাদাত বরণ করলে আরেকজনকে পতাকা হাতে তুলে নিতে বলেছেন। একে একে তিনজনই শহীদ হয়ে গেলে মুসলিম বাহিনীকে নিজেদের পছন্দমতো একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনজন সেনাপতি জানতেন, যখন নবীজি তাঁদের শাহাদাতের পর আরেকজন সেনাপতি নির্বাচন করতে বলেছেন তখন তাঁদের শাহাদাত বরণ করা ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু তবু তাঁরা পিছপা হননি। তন্মধ্যে একজন বের হওয়ার সময় বিবিসহ দু'আ করলেন। বিবি দু'আতে একপর্যায়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহ! আমার স্বামীকে যুদ্ধের পর গাজীরূপে ফিরিয়ে আনেন! এটা বলতে শুরু করলে স্বামী দু'আ শেষ করে ফেললেন। কারণ, তাঁর জানা ছিল, নবীজির কথা অনুযায়ী তাঁর শাহাদাত বরণ করতে হবে। তাই তিনি এর বিপরীত কোনো দু'আ শুনতে চাচ্ছিলেন না। এই ছিল সাহাবাদের জিহাদী জযবা ও প্রেরণা। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যুদ্ধ থেকে পিছপা হননি। এই যুদ্ধে লাগাতার দুই দিন যুদ্ধ হয়েছে। অবশেষে আল্লাহর রহমতে এই তিন হাজার মুসলমান দুই লক্ষ খ্রিস্টানের মোকাবেলা করে বিজয় অর্জন করছেন। আবার চিন্তা করুন, দুই লক্ষের মোকাবেলায় তিন হাজার জনের বিজয়! এটাই হলো খোদাঈ সাহায্য।

ঈমানী শক্তির আরেকটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

সম্প্রতি আফগানিস্তানের দিকে দেখেন। সেখানে বিশ্বের সুপার পাওয়ার ও পরাশক্তি একা নয়, পুরা দুনিয়ার শক্তি সাথে নিয়ে হামলা করেছে। কিন্তু এখন? এখন তারা চরম শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে লেজ গুটিয়ে আফগান ছেড়েছে। আমেরিকার পূর্বে রাশিয়াও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান সেখানকার মুক্তিকামী মুসলমান, উলমায়ে কেরাম ও ছাত্রদের সাথে যুদ্ধ করে পুরো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তারা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান। এই ঈমানী শক্তির সামনে দুনিয়ার কোনো সুপার পাওয়ার টিকতে পারবে না। কিভাবেই বা টিকবে? ঈমানদার হলো যিন্দাহ আর কাফের-মুশরিক হলো মুর্দাহ। মুমিন সজীব, বদদ্বীন নির্জীব। এক লাখ বা পাঁচ লাখ মুর্দাহ কি একজন যিন্দাহ ব্যক্তির সাথে পারবে। কোনোভাবেই পারবে না। তাই ২০টি বছর যুদ্ধ করে সুপার পাওয়ার আমেরিকাসহ অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্র আফগানিস্তানে তাদের সামনে টিকতে পারেনি। আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলোর তো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্রের কোনো অভাব ছিল না। সব ধরনের কলা-কৌশলও তাদের আয়ত্তে ছিল। সমরবিদ্যাও তাদের রপ্ত ছিল। এতদ্বসত্ত্বেও তারা কেন স্বাধীনতাকামীদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ, তাদের ঈমানী শক্তি ছিল না, অথচ উলামায়ে কেরাম সেই ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান ছিল। এই এক পার্থক্যের কারণেই জাগতিক বিবেচনায় সুপার পাওয়ার এখন জিরো পাওয়ার, আর জিরো এখন হিরো! বস্তুত ঈমানদারগণ যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে লড়তে থাকে, তাহলে সারা দুনিয়া এক হয়েও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহ ও রাসূলের এই ওয়াদা বর্তমান পৃথিবীতে আফগানিস্তানের বিজয়ের মধ্য দিয়ে আবারও সত্য প্রমাণিত হলো এবং লোকচক্ষুর সামনে বিষয়টি স্পষ্ট হলো। হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে টিকে

থাকবে যত দিন দুনিয়া ঠিক থাকবে, তত দিন জালুতের বিরুদ্ধে তালুতের বাহিনী, ফেরাউনের মোকাবেলায় হযরত মুসা (আ.), কাফেরদের বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে বদরী বাহিনীর মতো হক ও সত্যের একটি বাহিনী কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। কোনো অপশক্তি-পরাশক্তি তাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لا يزال طائفة من أمتى على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتى أمر الله عز وجل

অর্থ : সর্বদা একটি জামা'আত হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এই অবস্থা বহাল থাকবে আল্লাহর হুকুম আসার আগ পর্যন্ত। (অর্থাৎ কিয়ামত আসার আগ পর্যন্ত)। (ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ১০)

যদি সারা দুনিয়া মিলেও হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই জামা'আতকে শেষ করে দিতে চায়, তবুও তাদেরকে নিঃশেষ করতে পারবে না। তাদেরকে কত মারবে, কত কাটবে, ফাঁসি দেবে ও হত্যা করবে, তবে বিলুপ্ত করতে পারবে না। কোনো শক্তি তাদের মোকাবেলায় টিকতে পারবে না। কারণ, তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সেই দলভুক্ত করুন! আমীন!

আলোচনার সারসংক্ষেপ

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা যে উপদেশ গ্রহণ করতে পারি, তা হলো–

এক. একজন মুমিন হিসেবে সর্বদা বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেতনা ও প্রেরণা হৃদয়ে লালন করতে হবে।

দুই. মৃত্যুর ভয় না করে সর্বদা সত্যের পথে অবিচল থাকতে হবে।

তিন. সংখ্যাধিক্য কিংবা জাগতিক কোনো শক্তিতে নয়; বরং নির্ভর করতে হবে কেবল ঈমানী শক্তির ওপরে। আমাদের বস্তুবাদী ও জড়বাদী চিন্তা পরিহার করে এক আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান ও শক্তিশালী হতে হবে। সহায়-সম্বলের ওপর ভরসা না করে ঈমানী শক্তির ওপর নির্ভর করে যা আছে, তা নিয়ে পরিস্থিতির আলোকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বদা হকের পথে অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেওয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেওয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেওয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রিম বা জামানত নেওয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১৪০০	১৮০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১৯০০	২৭০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	২০০০	২৮০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	২৮০০	৪০০০
#	আমেরিকা	৩২০০	৪৩০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪
বিকাশ: ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭, রকেট: ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭-৯

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ মহা অপরাধ

শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী (দা.বা.)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ، اما بعد !

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ : صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ وَيَقُولُ :بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ يَقُولُ :أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكَانَ يَقُولُ :مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ

'জাবের' ও 'জাব্বার' শব্দের অর্থ :

হাদীসটি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন বিশিষ্ট আনসারী সাহাবী। মদীনা শরীফের অধিবাসী। নাম 'জাবের'। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে 'জাবের' বলা হয় অত্যাচারী মানুষকে। তাহলে এই সাহাবীর নাম জাবের কী করে রাখা হলো? আল্লাহ তা'আলার 'জাব্বার' নাম সম্পর্কেও এ প্রশ্ন জাগে। আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি আসমাউল হুসনার মধ্যে একটি নাম 'জাব্বার'ও রয়েছে। উর্দূ ভাষায় জাব্বার অর্থ বড় জালেম। এ কারণে সাধারণত মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে যে আল্লাহ তা'আলার জন্য 'জাব্বার' শব্দ কী করে ব্যবহার করা হলো?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, উর্দূ ভাষায় জাবের যে অর্থে ব্যবহার হয় আরবী ভাষায় সে অর্থে ব্যবহার হয় না। উর্দূতে 'জাবের' অর্থ জালেম, কিন্তু আরবীতে 'জাবের' বলা হয়, যিনি ভাঙা হাড় জোড়া লাগান তাকে। তাই 'জাবের' শব্দের অর্থ হলো, ভাঙা জিনিস জোড়ানেওয়ালা। এটি খারাপ কোনো অর্থ নয়। বরং অনেক ভালো অর্থ। একইভাবে 'জাব্বার' অর্থ হলো, অনেক বেশি ভাঙা জিনিস জোড়ানেওয়ালা। তাই আল্লাহ তা'আলার জাব্বার নামের অর্থ অত্যাচারী বা শাস্তিদাতা নয়, বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা ভাঙা জিনিস জোড়া দিয়ে থাকেন।

ভাঙা হাড় জোড়ানেওয়ালা সত্তা একজনই :

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো দু'আসমূহের একটিতে আল্লাহ তা'আলাকে এই নামে আহ্বান করা হয়েছে,

ياجابر العظم الكسير

হে ভাঙা হাড় জোড়ানেওয়ালা।

বিশেষভাবে এই নামে এ জন্য আহ্বান করেছেন যে সারা বিশ্বের সমস্ত ডাক্তার ও চিকিৎসক এ ব্যাপারে একমত যে হাড় ভেঙে গেলে তা জোড়া দেওয়ার মতো কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা নেই। মানুষের কাজ শুধু ভাঙা হাড়কে তার সঠিক পজিশনে স্থাপন করা। কিন্তু কোনো মলম, লোশন, ওষুধ বা মাজন এমন নেই, যা ভাঙা হাড়ের ওপর লাগিয়ে দিলে তা জোড়া লাগবে। জোড়াদাতা সত্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলাকে জাব্বার বলা হয়।

'কাহ্হার' শব্দের অর্থ :

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার আসমাউল হুসনার মধ্যে একটি নাম 'কাহ্হার'। উর্দূ পরিভাষায় 'কাহ্হার' বলা হয় তাকে যে মানুষের ওপর অত্যধিক জুলুম করে, ক্রোধান্বিত হয়, অনেক বেশি কষ্ট দেয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আসমাউল হুসনার মধ্যে যে 'কাহ্হার' শব্দ রয়েছে, তা আরবী ভাষার শব্দ, উর্দূ ভাষার নয়। আরবী ভাষায় 'কাহ্হার' শব্দের অর্থ বিজয়ী, প্রবল। অর্থাৎ যেই সত্তার সামনে সব কিছু দুর্বল, পরাস্ত, আর তিনি সবার ওপর সবল, বিজয়ী।

আল্লাহ তা'আলার কোনো নাম শাস্তি বোঝায় না :

আল্লাহ তা'আলার আসমাউল হুসনার মধ্যে কোনোটিই এমন নেই, যা শাস্তির অর্থ দেয়। সবগুলো নাম হয় রহমতের অর্থ দেয়, না হয় প্রতিপালনের অর্থ দেয়, না হয় কুদরতের অর্থ দেয়। যতটুকু আমার মনে হয়, আসমাউল হুসনার মধ্যে এমন একটি নামও নেই, যা শাস্তি বোঝায়। এটা এ কথার আলামত যে আল্লাহ তা'আলার আসল গুণ রহমত। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি রহীম, রহমান, কারীম। হ্যাঁ, বান্দা সীমা অতিক্রম করলে নিঃসন্দেহে তাঁর গজব নাযিল হয়। তাঁর আজাবও যথার্থ। যেমন কোরআনে কারীমের অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণ বর্ণিত হয়েছে এবং যেসব নাম তিনি ধারণ করেছেন, তার মধ্যে স্পষ্টভাবে আজাবের উল্লেখ নেই।

খুতবার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবস্থা

:
যা হোক, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُه

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে বক্তব্য দিতেন, তখন অনেক সময়ই তাঁর পবিত্র চোখ লাল হয়ে যেত। আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত। কারণ তিনি যা বলতেন, অন্তর থেকে বলতেন। তাঁর অন্তরে এই প্রেরণা ছিল যে কোনোভাবে শ্রোতাদের অন্তরে এ কথা বসে যাক। তারা কথা বুঝুক। তাঁর ওপর আমল আরম্ভ করুক। এ প্রেরণার তাগিদে কখনো কখনো তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত, জোশ উত্তেজিত হতো।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাবলীগের ধরন :

كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ :صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ

অনেক সময় মনে হতো, তিনি মানুষকে আক্রমণকারী বাহিনীর বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে ভাই! তোমাদের ওপর শত্রুবাহিনী আক্রমণোদ্যত, তা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা নাও! তিনি বলতেন, সেই বাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ খুব দ্রুত পৌঁছে যাবে। তাই তোমরা তা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা নাও!

এই বাহিনী দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামতের দিন ও তখনকার হিসাব-কিতাব। আল্লাহর সামনে জবাবদিহি এবং তার পরিণতিতে জাহান্নামের শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করতেন। এই মুহূর্ত সকাল বা সন্ধ্যায় যেকোনো সময় চলে আসতে পারে। একে ভয় করো! এ থেকে বাঁচার চেষ্টা করো!

আপনারা শুনে থাকবেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম যখন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে স্বজাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দেন, তখন মক্কায় যত খান্দান ছিল তাদের সবার নাম নিয়ে আহ্বান করেন। তাদের একত্র করেন। তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমি যদি তোমাদের বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একটি বাহিনী লুকিয়ে আছে, তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে তখন সমস্বরে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! আমরা আপনার এ কথা বিশ্বাস করব। কারণ আপনি জীবনে কখনো ভুল কথা বলেননি, কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, আপনি সাদেক (সত্যবাদী) ও আমীন (বিশ্বস্ত) হিসেবে বিখ্যাত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার অনেক কঠিন শাস্তি তোমাদের অপেক্ষায় আছে, সেই শাস্তি থেকে যদি বাঁচতে চাও তাহলে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করো।

আরবের লোকদের পরিচিত শিরোনাম :

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষণ-বক্তৃতায় এই চিত্রটি অনেক বেশি পাওয়া যায় যে 'আমি তোমাদেরকে শত্রুবাহিনীর ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করছি, যা তোমাদের ওপর আক্রমণোদ্যত।' ভীতি প্রদর্শনের জন্য এই উপস্থাপন ও শিরোনাম আরবদের অতি পরিচিত ছিল। কারণ আরবের লোকেরা সব সময় পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকত। এক গোত্র আরেক গোত্রের ওপর আক্রমণ করত। রাত-দিন এর ধারা অব্যাহত থাকত। যে ব্যক্তি তাদেরকে এসে জানাত যে অমুক শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ওত পেতে আছে। সেই সংবাদদাতাকে অনেক বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে তোমাদেরকে যেমন কোনো মানুষ শত্রুবাহিনীর ব্যাপারে সতর্ক করে থাকে, তেমনিভাবে আমিও তোমাদেরকে সতর্ক করছি যে অনেক বড় আজাব তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই আজাব সকাল বা সন্ধ্যায় পৌঁছে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রেরিত হওয়া ও কিয়ামত সন্নিকটে আসা :

এরপর বলেন,

وَيَقُولُ :بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

আমি এবং কিয়ামত এমনভাবে প্রেরিত হয়েছি, যেমন তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি। এই দুই আঙুল ওপরে উঠিয়ে তিনি বলেন, এই দুই আঙুলের মধ্যে যেমন বেশি দূরত্ব নেই, তেমনিভাবে আমার এবং কিয়ামতের মাঝেও বেশি দূরত্ব নেই। কিয়ামত খুব দ্রুত চলে আসবে। বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্বে যত উম্মত অতিবাহিত হয়েছে, তাদের নবীগণ মানুষদের যখন কিয়ামত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করতেন, তখন কিয়ামতের একটি বড় আলামত হিসেবে নবী করীম (সা.)-এর প্রেরিত হওয়ার কথা উল্লেখ করতেন যে কিয়ামতের একটি আলামত হলো, শেষ যুগে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) তাশরীফ আনবেন।

একটি প্রশ্নের উত্তর :

মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে যে হুজুর (সা.) আসার পর ১৪০০ বছর অতিক্রান্ত হলো, এখনো তো কিয়ামত এলো না? আসল কথা হলো, যখন থেকে দুনিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে যদি হিসাব করা হয়, তাহলে এক হাজার-দুই হাজার বছর এমন কোনো উল্লেখযোগ্য সময় নয়। এ কারণে রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার এবং কিয়ামতের মাঝে বেশি দূরত্ব নেই। কিয়ামত অতি দ্রুত চলে আসবে।

প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার কিয়ামত :

সমগ্র বিশ্বের সম্মিলিত কিয়ামত যতই দূরে হোক, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিয়ামত তো নিকটে। কারণ,

اذا مات احدكم فقد قامت قيامته

'যে মৃত্যুবরণ করল, সেদিনই তার কিয়ামত ঘটে গেল।'

এ কারণে যখন কিয়ামত আসবে তা সমষ্টিগত কিয়ামত হোক বা ব্যক্তিগত এবং তারপর কী ঘটবে তা আল্লাহই ভালো জানেন, এ জন্য আমি তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করছি যে ওই সময় আসার আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করো। সতর্ক হয়ে যাও। নিজেকে জাহান্নামের আজাব এবং কবরের আজাব থেকে রক্ষা করো।

উত্তম কথা ও উত্তম জীবন পদ্ধতি :

তারপর বলেন,

:أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرُ الْهُدٰى هَدْىُ مُحَمَّد

এ পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট কথা আল্লাহর কিতাব। এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে মহান, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং এর চেয়ে উত্তম কোনো কথা হতে পারে না। জীবনযাপনের যত পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি মুহাম্মদ (সা.)-এর পদ্ধতি। এ কথা হুজুর (সা.) নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে এ কথা বলে না যে আমার পদ্ধতি সবচেয়ে উত্তম। আমার চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ জন্যই পাঠিয়েছেন যে তিনি মানুষের জন্য আদর্শ হবেন। তাই জীবন অতিবাহিত করলে এভাবে করো। জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করো। এ কারণে দাওয়াতের প্রয়োজনে তিনি বলছেন যে উত্তম তরিকা ওইটা, যা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) রেখে গেছেন। ওঠা-বসা, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, অন্যের সাথে লেনদেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) যেই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার চেয়ে উত্তম কোনো পদ্ধতি হতে পারে না।

বিদ'আত সর্বনিকৃষ্ট গোনাহ :

এরপর যেসব জিনিসের কারণে গোমরাহীর সম্ভাবনা ছিল, তার মূল বলে দিয়েছেন।

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة

পৃথিবীতে সর্বনিকৃষ্ট কাজ দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা। হাদীস শরীফে বিদ'আতকে সর্বনিকৃষ্ট কাজ বলা হয়েছে। কেন? এ কারণে যে বিদ'আত একদিক থেকে অন্যান্য গোনাহ থেকে নিকৃষ্ট। কারণ যার অন্তরে যাররা পরিমাণ ঈমানও থাকবে, সেও অন্যান্য গোনাহ ও পাপাচারকে খারাপ মনে করবে। কোনো মুসলমান যদি গোনাহে লিপ্ত থাকে, মদ পান করে, ব্যাভিচার করে, মিথ্যা বলে, গীবত করে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এসব কাজকে তুমি কেমন মনে করো? উত্তরে সে এ কথাই বলবে যে এ কাজগুলো তো খারাপ, কিন্তু কী করব আমি ছাড়তে পারি না। যারা এসব কাজ করে তারাও এগুলোকে খারাপ মনে করে। যেহেতু তারা খারাপ মনে করে, তাই আল্লাহ তা'আলা এক সময় না এক সময় তাদেরকে তাওবা করার তাওফীক দান করবেন।

কিন্তু বিদ'আত, অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত জিনিস মৌলিকভাবে গোনাহ হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা করে, সে এটাকে খারাপ মনে করে না। সে মনে করে যে এটা তো খুব ভালো কাজ। অন্য কেউ যদি বলে, এটা খারাপ কাজ তাহলে ঝগড়া করার জন্য উদ্যত হয়। বিতর্ক করার জন্য প্রস্তুত হয় যে এতে খারাপের কী আছে? এতে অন্যায় কী হয়েছে? যখন এক ব্যক্তি গোনাহকে গোনাহই মনে করে না এবং খারাপকে খারাপ মনে করে না, পরিণতিতে সে আরো শক্তভাবে গোমরাহ হতে থাকে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) شــر الامــور বলেছেন। যার অর্থ হলো, যত খারাপ কাজ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো, বিদ'আত। অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা, যা রাসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। এরপর তার কারণও বলে দিয়েছেন যে প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী। তাই যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতের মধ্যে লিপ্ত, সে স্বাভাবিকভাবেই গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত।

বিদ'আত বিশ্বাসগত গোমরাহী :

একটি হলো আমলগত ত্রুটি। একজন মানুষ আমলের ত্রুটিতে লিপ্ত। সে অন্যায় কাজ করছে। গোনাহের কাজ করছে। আর এক হলো বিশ্বাসগত ভ্রষ্টতা। এক ব্যক্তি একটি নাহক বিষয়কে হক মনে করছে। গোনাহকে সাওয়াব মনে করছে। কুফুরকে ঈমান মনে করছে। আমলি ত্রুটির সমাধান তো সহজ। এক সময় না এক সময় তাওবা করলে মাফ হয়ে যাবে, কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহকে সাওয়াব মনে করে, তার হিদায়াত খুব কঠিন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নিকৃষ্টতম গোনাহ হলো বিদ'আতের গোনাহ। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম বিদ'আত থেকে এত বেশি দূরে থাকতেন, যা বলার ভাষা নেই।

বিদ'আতের সবচেয়ে খারাপ দিক :

বিদ'আতের সবচেয়ে খারাপ দিক এই যে মানুষ নিজেই দ্বীনের উদ্ভাবক হয়ে যায়। অথচ দ্বীনের উদ্ভাবক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যে দ্বীন দিয়েছেন, তাই আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য। কিন্তু বিদ'আতী ব্যক্তি নিজেই দ্বীনের পন্থা উদ্ভাবনকারী হয়ে যায়, আর মনে করে যে আমিই দ্বীনের সঠিক পথ বানাচ্ছি। তাই সে যেন দাবি করছে যে আমি যা বলছি তা দ্বীন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দ্বীনের যেই পথ বলে দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম যার ওপর আমল করেছেন, আমি তাদের চেয়ে বড় দ্বীনদার। আমি তাদের চেয়ে বেশি দ্বীন বুঝি। এটা শরীয়তের অনুসরণ নয়, এটা প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণ।

দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত, আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত :

হিন্দু ধর্মের অনেক মানুষ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য গঙ্গার তীরে এমন সব সাধনা করে থাকে, যা দেখে মানুষ বিস্মিত হয়। কোনো কোনো মানুষ নিজের হাত ওপর দিকে উঠিয়ে বহু বছর ধরে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে কখনোই হাত নিচু করে না। কোনো মানুষ দম বন্ধ করে রাখে, কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত আর শ্বাস নেয় না। তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি এ কাজ কেন করছো? সে উত্তরে বলবে, আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য এ কাজ করছি। সে আল্লাহকে ভগবান নামে বলুক বা অন্য কিছু বলুক। কিন্তু বলুন, তার এ কাজের কোনো মূল্য আছে? অথচ বাহ্যিকভাবে তার নিয়্যাত ভালো। কিন্তু এর পরও আল্লাহ তা'আলার নিকট তার কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার যেই পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানো নয়। তারা এসব পদ্ধতি নিজস্ব চিন্তা-চেতনা থেকে মনগড়াভাবে নিয়েছে। এ কারণে আল্লাহর নিকট তাদের কোনো আমল কবুল হবে না। এ ধরনের আমলের ব্যাপারে কোরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَدِمْنا إِلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً

যারা এ ধরনের আমল করে আমি তাদের আমলকে এভাবে উড়িয়ে দিই, যেমন বাতাসে উড়ানো ধুলাবালি। (সূরা ফুরকান ২৩)

আমল করল, কিন্তু বৃথা। পরিশ্রম করল, কিন্তু বেকার। অন্যত্র অতিপ্রিয় ও স্নেহপূর্ণ আঙ্গিকে কোরআনে কারীম বলে,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) (الكهف)

কোরআনে কারীম নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করে বলে, আপনি মানুষদেরকে বলে দিন! আমি কি তোমাদেরকে বলব, এ দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারপর বলেন, এরা ওই সমস্ত লোক, যাদের আমল দুনিয়ার জীবনে বৃথা গেল আর তারা মনে মনে চিন্তা করে যে খুব ভালো কাজ করছে। এরা এ জন্য ক্ষতিগ্রস্ত যে যারা পাপাচারী, যারা কাফের, তারা তো কমপক্ষে দুনিয়াতে মজা উড়াল, আখেরাত বরবাদ হলেও দুনিয়া ভোগ করল। আর এরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশও নষ্ট করল, পরিশ্রম করল আর আখেরাতও নষ্ট করল। কারণ তারা ইবাদতের এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেননি।

এ কারণেই বিদ'আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) شــــر الامـــور বলেছেন, তথা সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো বিদ'আত। কারণ মানুষ পরিশ্রম করে, অথচ কিছুই অর্জন হয় না।

দ্বীন অনুসরণের নাম :

আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদের অন্তরে এ কথা বসিয়ে দিন যে দ্বীন মূলত আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণের নাম। নিজের পক্ষ থেকে কোনো বিষয় বানিয়ে নেওয়ার নাম দ্বীন নয়। আরবীতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়, ইত্তিবা' (اتبــــاع) ও ইবতিদা' (ابتـداع)। ইত্তিবা' (اتبـــاع) অর্থ হলো, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চলা। আর ইবতিদা' (ابتداع) অর্থ হলো, নিজের পক্ষ থেকে কোনো জিনিস উদ্ভাবন করে তার অনুগামী হওয়া। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলিফা হওয়ার পর সর্বপ্রথম যেই খুতবা দেন তাতে তিনি বলেন,

انما انا متبع ولست بمبتدع

আমি আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধানের অনুসারী, উদ্ভাবনকারী নই।

অর্থাৎ নতুন কোনো পথ উদ্ভাবনকারী আমি নই। তাই যত মূল্য আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে মাথা নত করার মধ্যে। নিজের পক্ষ থেকে যে কাজ করা হবে তার কোনো ওজন ও মূল্য নেই।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা :

একটি ঘটনা আপনারা অনেকবার শুনে থাকবেন যে হাদীস শরীফে এসেছে, হুজুর (সা.) কখনো কখনো রাতের বেলা সাহাবায়ে কেরাম কে কী করছেন, তা দেখার জন্য বের হতেন। একবার তাহাজ্জুদের সময় হুজুর (সা.) ঘর থেকে বের হলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। দেখলেন, তিনি তাহাজ্জুদের নামাযে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিম্নস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করছেন। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছেন তাতে তিনি উঁচুস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করছেন। তাঁর তিলাওয়াতের আওয়াজ বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে। তিনি এ অবস্থা দেখে চলে এলেন।

পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুক (রা.)-কে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বললেন, আমি রাতে তাহাজ্জুদের সময় আপনার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আপনি খুব নিম্নস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন। আপনি এত নিম্নস্বরে কেন তিলাওয়াত করছিলেন? উত্তরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বড় চমৎকার কথা বললেন।

اسمعت من ناجيت

হে আল্লাহর রাসূল! যেই সত্তার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, যাঁর সঙ্গে আমি সম্পর্ক স্থাপন করছিলাম, যাঁকে আমি শোনাতে চাচ্ছিলাম, তাঁকে তো শুনিয়েছি। তাই উচ্চস্বরের কী প্রয়োজন? এ কারণে আস্তে তিলাওয়াত করছিলাম।

তারপর হযরত ওমর ফারুক (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জোরে জোরে

তিলাওয়াত করছিলেন তার কী কারণ? উত্তরে তিনি বললেন,

اوقظ الوسنان واطرد الشيطان

আমি এ জন্য জোরে তিলাওয়াত করছিলাম, যাতে ঘুমন্ত লোকেরা জাগ্রত হয় এবং শয়তান পালিয়ে যায়। যত জোরে তিলাওয়াত করব শয়তান তত দূরে পালাবে। এ কারণে আমি জোরে তিলাওয়াত করছিলাম।

লক্ষ করুন! উভয়ের কথা যথাস্থানে সঠিক। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কথাও ঠিক যে আমি তো আল্লাহ তা'আলাকে শোনাচ্ছি। অন্যেকে শোনানোর কী প্রয়োজন? হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর কথাও ঠিক। আমি ঘুমন্তদের জাগ্রত করছিলাম এবং শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম। কিন্তু রাসূল এরপর তাঁদের উভয়কে সম্বোধন করে বললেন, হে আবু বকর! আপনি নিজ বুদ্ধিতে এই পথ অবলম্বন করেছেন যে খুব আস্তে তিলাওয়াত করা উচিত। হে ওমর ফারুক! আপনি নিজ বুদ্ধিতে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে জোরে তিলাওয়াত করা উচিত। আপনারা উভয়ে নিজ নিজ বুদ্ধিমতে এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাই তা পছন্দনীয় নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অধিক জোরেও তিলাওয়াত করবে না, অধিক আস্তেও তিলাওয়াত করবে না। মধ্যম পন্থায় তিলাওয়াত করবে। এরই মধ্যে অধিক নূর ও বরকত রয়েছে। এরই মধ্যে অধিক উপকার রয়েছে। এ পন্থা অবলম্বন করুন।

বোঝা গেল, ইবাদতের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোনো পন্থা অবলম্বন করা আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানো পন্থাই পছন্দনীয়। তাতে যেই নূর ও উপকার রয়েছে, তা অন্য কোনোটার মধ্যে নেই। দ্বীনের আসল প্রাণ হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক ইবাদত করা। নিজের পক্ষ থেকে কোনো পদ্ধতি বানিয়ে নেওয়া ঠিক নয়।

এক বুজুর্গের চোখ বন্ধ করে নামায পড়া :

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যা হযরত থানভী (রহ.) তাঁর ওয়াজের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে তাঁর সমসাময়িক একজন বুজুর্গ ছিলেন। তিনি চোখ বন্ধ করে নামায পড়তেন। ফকীহগণ লিখেছেন, নামাযের সময় চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ। তবে কারো যদি এ ছাড়া খুশুখুজু লাভ না হয় তার জন্য চোখ বন্ধ করে নামায পড়া জায়েয। এতে কোনো গোনাহ হবে না। ওই বুজুর্গ খুব উত্তমরূপে নামায পড়তেন। নামাযের সব অঙ্গ সুন্নাত মোতাবেক আদায় করতেন। মানুষের মধ্যে তার নামায বিখ্যাত ছিল। অত্যন্ত বিনয় ও খুশুখুজুর সঙ্গে নামায পড়তেন। কিন্তু চোখ বন্ধ করে নামায পড়তেন। ওই বুজুর্গ কাশফের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আমি যেই নামায পড়ি তা আপনার নিকট কবুল কি না এবং কোন পর্যায়ের কবুল ও তার আকৃতি কেমন তা আমাকে দেখান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই দরখাস্ত কবুল করেন। অনিন্দ্য সুন্দরী এক নারী সামনে আসে। যার মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত উপযোগী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তার চোখ নেই। অন্ধ। তাঁকে বলা হলো, এই হলো তোমার নামায। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! এত অপূর্ব সুন্দরী নারী, কিন্তু তার চোখ কোথায়? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি চোখ বন্ধ করে নামায পড়ে থাকো, এ কারণে তোমার নামাযকে অন্ধ নারীর আকারে দেখানো হয়েছে।

নামাযের মধ্যে চোখ বন্ধ করার বিধান :

ঘটনাটি হযরত হাজী সাহেব (রহ.) বর্ণনা করেছেন। হযরত থানভী (রহ.) এ ঘটনার ওপর মন্তব্য করে বলেন, আসল কথা হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল চোখ খুলে নামায পড়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানো পদ্ধতি। অন্য পদ্ধতি যদিও জায়েয, কিন্তু তাতে সুন্নাতের নূর অর্জন হতে পারে না। ফকীহগণ বলেছেন, নামাযের মধ্যে অনাহূত চিন্তা অধিক হলে তা প্রতিহত করার জন্য এবং খুশুখুজু লাভের জন্য কোনো ব্যক্তি যদি চোখ বন্ধ করে নামায পড়ে, তবে তা জায়েয, এতে কোনো গোনাহ হবে না, কিন্তু তা সুন্নাতের পরিপন্থী। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কোনো নামায চোখ বন্ধ করে পড়েননি। তারপর সাহাবায়ে কেরামও কখনো কোনো নামায চোখ বন্ধ করে পড়েননি। এ জন্য বলেছেন যে এমন নামাযে সুন্নাতের নূর লাভ হবে না।

নামাযের মধ্যে অনাহূত চিন্তা :

মানুষ মনে করে যে নামাযের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা আসে তাই চোখ বন্ধ করে নামায পড়ি। কিন্তু জানা থাকা দরকার যে অনিচ্ছাকৃতভাবে চিন্তার উদয় হলে সে কারণে আল্লাহ তা'আলা ধরবেন না। সুন্নাতের অনুসরণে নামায পড়া হচ্ছে, আর তার মধ্য অনিচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন চিন্তা উদয় হচ্ছে, সে নামায এমন চোখ বন্ধ করে পড়া নামাযের চেয়ে উত্তম, যার মধ্যে অনাহূত চিন্তা আসছে না। কারণ প্রথম পদ্ধতির নামায রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণে আদায় হচ্ছে। আর এই দ্বিতীয় পদ্ধতির নামায রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণে আদায় হচ্ছে না। আসল বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ করা, নিজের থেকে কিছু না করা। এরই নাম দ্বীন। আমরা নিজেরা চিন্তা-ভাবনা করে থাকি যে অমুক ইবাদত এভাবে হতে হবে, অমুক ইবাদত এভাবে হওয়া উচিত। এসব আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য

নয়। এ জন্য বলেছেন,

كل بدعة ضلالة

সব বিদ'আত গোমরাহী।

বিদ'আতের সঠিক সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা :

আরেকটি বিষয় বলছি যে সম্পর্কে অনেক মানুষ জিজ্ঞেস করে থাকে, তা হলো, সব নতুন বিষয় যেহেতু গোমরাহী, তাহলে বৈদ্যুতিক এই পাখাও গোমরাহী, টিউবলাইটও গোমরাহী, বাস-মোটরও গোমরাহী। কারণ এগুলো তো হুজুর (সা.)-এর জমানায় ছিল না। পরবর্তীতে হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করাকে বিদ'আত বলা হয় না কেন?

খুব ভালো করে বুঝুন! আল্লাহ তা'আলা যেই বিদ'আতকে নাজায়েয ও হারাম সাব্যস্ত করেছেন তা হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবন করা। তাকে দ্বীনের অংশে পরিণত করা। যেমন এরূপ বলা যে আমাদের বলার পদ্ধতির মতো ইসালে সাওয়াব হবে। অর্থাৎ তিন দিনে হবে, দশ দিনে হবে, চল্লিশ দিনে হবে। এভাবে যে ইসালে সাওয়াব করবে না সে বাতিল।

মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খানা প্রস্তুত করে পাঠাও :

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা হলো, কারো বাড়িতে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটলে অন্যদের উচিত, তার বাড়িতে খানা রান্না পাঠানো। হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রা.) মুতার যুদ্ধে শহীদ হলে হুজুর (সা.) নিজের পরিবারের লোকদের বললেন,

اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد اتاهم امر شغلهم

জাফরের পরিবারের লোকদের জন্য খানা রান্না করে পাঠাও। কারণ তারা শোকে মুহ্যমান।

তো হুজুর (সা.)-এর শিক্ষা হলো, বেদনগ্রস্ত লোকদের জন্য খাবার পাঠাও। তারা শোকসন্তপ্ত। তারা খাবার পাকানোতে আত্মনিয়োগ করবে না।

বর্তমানে উল্টা গঙ্গা বইছে :

বর্তমানে উল্টা গঙ্গা বইছে যে যারা শোকসন্তপ্ত, তারা খাবার তৈরি করবে, শুধু তা-ই নয় বরং তারা দাওয়াত দেবে। শামিয়ানা টানাবে। ডেগ ভরে খাবার রান্না করবে। দাওয়াত না করা হলে সমাজে ইজ্জত থাকবে না। এমনও শোনা গেছে যে দাওয়াত না করা হলে মৃত ব্যক্তিকেও ক্ষমা করা হয় না। তাকে পর্যন্ত গালমন্দ করা হয়।

মৃত ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াতের আয়োজন না করা হলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। নাউজুবিল্লাহ। সেই দাওয়াতও করা হয় মৃত ব্যক্তির পরিতাজ্য সম্পদ থেকে। যার মধ্যে এখন সকল ওয়ারিশের হক প্রতিষ্ঠি হয়েছে। তাদের মধ্যে নাবালেগও থাকে। নাবালেগের সম্পদে সামান্য হস্তক্ষেপ করাও হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার পরিপন্থী। এর পরও বলা হচ্ছে যে এগুলো করবে না সে মরদুদ-বিতাড়িত।

দ্বীনের অংশ বানানো বিদ'আত :

তাই দ্বীনের অংশ বানিয়ে এবং আবশ্যকীয় সাব্যস্ত করে দ্বীনের মধ্যে কোনো জিনিস উদ্ভাবন করা বিদ'আত। তবে কোনো জিনিস যদি দ্বীনের অংশ না হয়, বরং নিজের ব্যবহার ও আরামের জন্য কেউ কোনো জিনিস অবলম্বন করে। যেমন বাতাসের জন্য পাখা বানাল। আলোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করল। ভ্রমণের জন্য গাড়ি ব্যবহার করল, তাহলে এগুলো বিদ'আত হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবী কাজে জায়েযের আওতার মধ্যে উন্মুক্ত ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু দ্বীনের অংশ বানিয়ে তথা মুস্তাহাব নয়, এমন জিনিসকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করে, সুন্নাত নয় এমন জিনিসকে সুন্নাত সাবস্ত করে, ওয়াজিব নয়, এমন জিনিসকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে যখন কোনো জিনিস উদ্ভাবন করা হবে, তখন তা বিদ'আত ও হারাম হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর (রা.)-এর বিদ'আত থেকে দূরে সরে যাওয়া :

সাহাবায়ে কেরাম বিদ'আত থেকে খুব বেশি দূরে থাকতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একবার এক মসজিদে নামায পড়ার জন্য তাশরীফ নিয়ে যান। আযান হয়ে গেছে। এখনো জামা'আত শুরু হয়নি। এমন সময় মুয়াজ্জিন মানুষের জমায়েত নিশ্চিত করার জন্য আওয়াজ দিয়ে বলেন

الصلاة جامعة চলে আসো, নামায শুরু হতে চলেছে। একবার সম্ভবত حي على الصلاة ও বলে। যাতে করে যারা এখনো আসেনি, তারা দ্রুত চলে আসে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এ শব্দ শোনামাত্র তাঁর সাথিদের বললেন,

اخرج بنا من عند هذا المبتدع

আমাকে এই বিদ'আতীর নিকট থেকে নিয়ে চলো। কারণ সে বিদ'আত করছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) একবার আযান দেওয়ার বিধান দিয়েছেন, তা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়বার ঘোষণা দেওয়া হুজুর (সা.)-এর তরিকা নয়। এটা বিদ'আত। তাই আমাকে এ মসজিদ থেকে বের করে নিয়ে চলো।

কিয়ামত ও বিদ'আত উভয়টা ভয়ের জিনিস :

এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ হাদীসে একদিকে নিজের উম্মতকে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে একটি বাহিনী সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে। অন্যদিকে একই সঙ্গে ভবিষ্যতে আগমনকারী গোমরাহী থেকে বাঁচানোর জন্য ইরশাদ করছেন, নিকৃষ্টতর জিনিস তা যা মানুষ নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে দ্বীনের অংশ সাব্যস্ত করে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সেটাকে দ্বীনের পদ্ধতি সাব্যস্ত করেননি। তা থেকে বেঁচে থাকো। অন্যথায় তা তোমাদের

গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাবে।

আমাদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী কে? :

পরবর্তী বাক্যে বলেন,

انا اولى بكل مؤمن من نفسه

আমি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য তার জানের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ মানুষ নিজে তার জানের এ পরিমাণ কল্যাণকামী হতে পারে না, যে পরিমাণ আমি তোমাদের জন্য কল্যাণকামী। যেমন একজন পিতা তার সন্তানকে স্নেহ করে। তার কষ্ট বহন করে। তার জন্য পরিশ্রম করে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রাণের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী। আমি তোমাদেরকে যা কিছু বলছি তা নিজের স্বার্থে বলছি না, তোমাদের লাভের জন্য বলছি। কারণ আমার আশঙ্কা হয় যে এ জাতি গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে নিজেকে জাহান্নামের উপযুক্ত না বানিয়ে নেয়। তারপর বলেন,

من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فالى وعلى

অর্থাৎ আখেরাতে তো আমি তোমাদের কল্যাণকামী হবোই, তবে দুনিয়াতেও কোনো ব্যক্তি যদি পরিত্যাজ্য সম্পদ রেখে যায় তাহলে তা পরিবারের লোকেরা পাবে। তারা শরীয়তের বিধান মোতাবেক নিজেদের মধ্যে তা বন্টন করে নেবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে যায়, আর পরিত্যাজ্য সম্পদ দ্বারা তা পরিশোধ করা না যায়, বা এমন কোনো সন্তান রেখে যায় যার দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো কোনো লোক নেই, তাহলে আমি সারা জীবন ওই ঋণ ও সন্তানের দায়িত্ব বহন করব। এ কথাগুলো এ জন্য বলেছেন, যাতে বিশ্বাস হয় যে তোমাদের কল্যাণ আমার কাম্য, তোমাদের টাকা-পয়সা নয়। যেমন ইতিপূর্বে হাদীসে গিয়েছে, আমি তোমাদের কোমর ধরে জাহান্নাম থেকে বাধা দিচ্ছি, আর তোমরা তাতে পতিত হচ্ছ। আমি তোমাদেরকে এসব গোনাহ থেকে বাঁচাচ্ছি, বিদ'আত থেকে বাঁচাচ্ছি, যাতে জাহান্নামের আজাব থেকে তোমরা রক্ষা পাও।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে কিভাবে বিপ্লব ঘটল?

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ সব কথাই সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তাদের মধ্যে এমন পরিবর্তন সাধন করেছে যে একেকজন সাহাবী অনেক উচ্চ মার্গে পৌঁছে গিয়েছেন। অন্তর থেকে কথা বের হলে অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একেকটি বাণী মানুষের জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আজ আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তব্য দিই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দ্বীনের কথা বলি, কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসে না, কোনো বিপ্লব ঘটে না, কোনো নড়াচড়া হয় না। কারণ অনেক সময় বক্তার নিজেরই তার কথার ওপর আমল থাকে না। তা ছাড়া আমাদের অন্তরে সেই প্রেরণা ও বেদনা নেই, যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথার দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। আজও সরাসরি কোরআনের শব্দমালায় এবং সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীতে যেই প্রভাব রয়েছে, যত আকর্ষণীয় বক্তব্যই হোক তার মধ্যে সেই প্রভাব থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন।

বিদ'আত কী?

অনেকে বলেন, বিদ'আত দুই প্রকার। বিদ'আতে হাসানা ও বিদ'আতে সায়্যিআ। অর্থাৎ কতক কাজ বিদ'আত হলেও তা ভালো। আর কতক কাজ বিদ'আতও, আবার মন্দও। এ জন্য কোনো ভালো কাজ আরম্ভ করা হলে, সেটা বিদ'আতে হাসানা হবে। তার মধ্যে খারাপ দিক নেই।

বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ :

খুব ভালো করে বুঝুন! কোনো বিদ'আতই ভালো নয়। সব বিদ'আতই খারাপ। আসল কথা হলো, বিদ'আতের দুটি অর্থ রয়েছে। একটি আভিধানিক, আরেকটি পারিভাষিক। অভিধানে বিদ'আতের অর্থ করা হয়েছে 'নতুন জিনিস'। তাই যেকোনো নতুন জিনিসকেই আভিধানিকভাবে বিদ'আত বলতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ এই– পাখা, বিদ্যুৎ, ট্রেন, উড়োজাহাজ প্রভৃতি আভিধানিকভাবে সবই বিদ'আত। কারণ এসব জিনিস বর্তমান যুগের উদ্ভাবিত। ইসলামের প্রথম যুগে এগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। এ সবই নতুন জিনিস।

কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় সব নতুন জিনিসকে বিদ'আত বলা হয় না। বরং বিদ'আতের অর্থ হলো, দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন সুন্নাত সাব্যস্ত করেননি এবং সেই পদ্ধতিকে মনগড়াভাবে মুস্তাহাব, সুন্নাত ও আবশ্যকীয় সাব্যস্ত করা। এই পারিভাষিক অর্থে যেগুলোকে বিদ'আত বলা হয় তার কোনোটাই ভালো নয়। এর কোনোটাই বিদ'আতে হাসানা নয়, প্রত্যেকটাই বিদ'আতে সায়্যিআ।

শরীয়তপ্রদত্ত স্বাধীনতার ওপর শর্তারোপ করা জায়েয নেই :

তবে যে সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ তা'আলা বৈধ করেছেন বা রাসূল (সা.) সুন্নাত ও সাওয়াবের কাজ সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু শরীয়তে তার বিশেষ কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়নি যে এভাবে করলে সাওয়াব অধিক হবে, আর এভাবে করলে সাওয়াব কম হবে। এ ধরনের কাজকে যেকোনো পদ্ধতিতে আঞ্জাম দেওয়া হলে তা সাওয়াবের কারণ হবে।

ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি :

উদাহরণস্বরূপ মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সাওয়াব করা অনেক বড় ফজীলতের

জিনিস। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সাওয়াব করে সে দ্বিগুণ সাওয়াব পায়। প্রথমত, নেক আমল করার সাওয়াব। দ্বিতীয়ত, মুসলমানের সঙ্গে সহমর্মিতার সাওয়াব। কিন্তু শরীয়ত ইসালে সাওয়াবের জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করেনি যে ইসালে সাওয়াব শুধু কোরআন শরীফ পাঠ করেই করতে হবে বা দান করে করতে হবে বা নামায পড়ে করতে হবে; বরং যেকোনো সময় যেকোনো নেক আমলেরই তাওফীক লাভ হয়, সেই নেক আমলের ইসালে সাওয়াব করা জায়েয। কোরআন তিলাওয়াত করেও ইসালে সাওয়াব করতে পারে, দান করেও ইসালে সাওয়াব করতে পারে, নফল নামায পড়েও ইসালে সাওয়াব করতে পারে, জিকির-তাসবীহ করেও ইসালে সাওয়াব করতে পারে। এমনকি কেউ যদি কিতাব লিখে থাকে, রচনা ও সংকলন করে থাকে, তারও ইসালে সাওয়াব করতে পারে। ওয়াজ-নসিহত করে তারও ইসালে সাওয়াব করতে পারে। মোটকথা, যত নেক কাজ আছে, সব কিছুরই ইসালে সাওয়াব করতে পারে। এমনিভাবে শরীয়ত ইসালে সাওয়াবের কোনো দিন নির্ধারণ করেনি যে অমুক দিন করো, অমুক দিন করো না। বরং কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর যেকোনো সময় ইচ্ছা ইসালে সাওয়াব করতে পারে। মৃত্যুর পরবর্তী প্রথম দিন হোক, দ্বিতীয় দিন হোক, তৃতীয় দিন হোক, যেদিন ইচ্ছা করতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো দিন নেই। তাই ইসালে সাওয়াবের শরীয়তসম্মত যেকোনো পন্থা অবলম্বন করলে তাতে দোষের কিছু নেই।

কিতাব লিখে তার ইসালে সাওয়াব করতে পারে :

উদাহরণস্বরূপ সাধারণ মুসলমানের উপকারার্থে একটি কিতাব লিখলাম। কিতাব লেখার উদ্দেশ্য দ্বীনের দাওয়াত এবং তাবলীগ। কিতাবটি লিখে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! কিতাব লেখার সাওয়াব আপনি অমুক ব্যক্তিকে পৌঁছিয়ে দিন। তাহলে এভাবে ইসালে সাওয়াব করা ঠিক আছে। অথচ কিতাব লিখে ইসালে সাওয়াব করার কাজ না রাসূল (সা.) কখনো করেছেন, আর না সাহাবায়ে কেরাম কখনো করেছেন। কারণ তাঁরা তো কোনো কিতাবই লেখেননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসালে সাওয়াব করার ফজীলত বর্ণনা করেছেন, তাই এভাবে ইসালে সাওয়াব করা বিদ'আত নয়। কিন্তু আমি যদি বলি যে কিতাব লিখে ইসালে সাওয়াব করার পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় উত্তম এবং এই পদ্ধতিই সুন্নাত, তাহলে আমার এই আমলই যা সাওয়াবের কারণ ছিল, বিদ'আত হয়ে যাবে। কারণ আমি নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনের মধ্যে এমন একটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত করলাম, যা দ্বীনের অংশ নয়।

তৃতীয় দিন আবশ্যক করা বিদ'আত :

এমনিভাবে প্রত্যেক দিনই ইসালে সাওয়াব করা জায়েয। প্রথম দিনেও, দ্বিতীয় দিনেও এবং তৃতীয় দিনেও। কোনো ব্যক্তি তৃতীয় দিনে ইসালে সাওয়াব করলে তাতে কোনো দোষ নেই, এটা জায়েয। কিন্তু কেউ যদি বলে যে ইসালে সাওয়াবের জন্য বিশেষভাবে তৃতীয় দিন নির্ধারিত এবং তৃতীয় দিনেই ইসালে সাওয়াব করা অধিক ফজীলতের কারণ বা এটা সুন্নাত। অথবা যদি বলে যে কোনো ব্যক্তি তৃতীয় দিনে ইসালে সাওয়াব না করলে তিরস্কার ও ভর্ৎসনারযোগ্য, তাহলে তৃতীয় দিনে ইসালে সাওয়াব করা বিদ'আত হবে। কারণ সে নিজের পক্ষ থেকে আমলটিকে একটি বিশেষ দিনে জরুরি ও আবশ্যক সাব্যস্ত করেছে।

জুমু'আর দিন রোজা রাখার নিষেধাজ্ঞা :

রাসূলুল্লাহ (সা.) জুমু'আর দিনের অনেক ফজীলত বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,

قلما كان يفطر يوم الجمعة

এমন খুব কমই হয়েছে যে জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) রোজা রাখেননি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বেশির ভাগ জুমু'আর দিন রোজা রাখতেন। তাই ফজীলতপূর্ণ এই দিনটি রোজা অবস্থায় অতিবাহিত হলে ভালো। কিন্তু রাসূলের দেখাদেখি মানুষ জুমু'আর দিনেও রোজা রাখতে আরম্ভ করল এবং জুমু'আর দিনকে রোজার জন্য এমনভাবে নির্ধারণ করল, যেভাবে ইহুদিরা শনিবারকে নির্ধারণ করে থাকে। ইহুদিরা শনিবার দিন রোজা রেখে থাকে। তারা শনিবার দিন রোজা রাখায় বিশেষ ফজীলত ও গুরুত্ব আছে মনে করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন এ অবস্থা দেখলেন তখন জুমু'আর দিন রোজা রাখতে সাহাবায়ে কেরামকে নিষেধ করে দিলেন। তিনি বললেন, জুমু'আর দিন কেউ রোজা রাখবে না। এটা তিনি এ জন্য বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেই দিনকে রোজার জন্য নির্ধারণ করেননি, তা যেন মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে নির্ধারণ না করে এবং অন্যরা এ আমলকে জরুরি মনে করতে আরম্ভ না করে। এ জন্য তিনি রোজার জন্য জুমু'আর দিনকে নির্ধারণ করতে নিষেধ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও এটাকে জরুরি মনে করতেন না এবং অন্যদের জন্যও এটাকে জরুরি সাব্যস্ত করতে চাইতেন না।

তিন দিন, দশ দিন ও চল্লিশ দিনের ইসালে সাওয়াবের অবস্থান :

আমি বলছিলাম তিন দিন, দশ দিন, বিশ দিন ও চল্লিশ দিনে ইসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠান জায়েয নেই। কারণ মানুষ এই দিনগুলোকে ইসালে সাওয়াবের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। কোনো মানুষ যদি ইসালে সাওয়াবের জন্য কোনো দিন নির্ধারণ না করে ঘটনাচক্রে তিন দিনের দিন ইসালে সাওয়াব করে তাহলে তাতেও কোনো

দোষ নেই। কিন্তু যেহেতু আজকাল তৃতীয় দিনকেই কতক মানুষ আবশ্যক মনে করে থাকে, এ জন্য তাদের সাদৃশ্য থেকে বাঁচার জন্য বিশেষভাবে তৃতীয় দিন এ কাজ না করলে অধিক ভালো।

আঙুল চুম্বন করা কেন বিদ'আত?

আপনি মসজিদ থেকে আযানের আওয়াজ শুনলেন। আযানের মধ্যে যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' শুনলেন, তখন আপনার অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসা জাগ্রত হলো। তাঁর ভালোবাসায় বিহ্বল হয়ে আপনি আঙুল চুম্বন করে চোখে লাগালেন। তাহলে মৌলিকভাবে এ কাজ গোনাহ বা বিদ'আত নয়। কারণ এ কাজ আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুহাব্বত ও আযমত প্রশংসাযোগ্য বিষয়। ঈমানের আলামত। এই মুহাব্বতের কারণে ইনশাআল্লাহ সাওয়াব লাভ হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি দুনিয়ার সব মানুষকে বলতে আরম্ভ করে যে যখনই আযানের মধ্যে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলা হবে, তখন তোমরা সকলে আঙুল চুম্বন করবে। কারণ এ সময় বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত। যে ব্যক্তি এ সময় আঙুল চুম্বন করে না সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ভালোবাসে না, তাহলে যে আমল ভালোবাসার প্রেরণায় করার ফলে জায়েয ছিল, তা এখন বিদ'আত হয়ে গেল। এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে যে এই জায়েয আমলটি যদি সঠিক প্রেরণা নিয়ে করা হয় এবং মনগড়াভাবে কোনো শর্তারোপ করা না হয়, তাহলে বিদ'আত নয়। আর যদি এ কাজটিকেই নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়, বা এটাকে সুন্নাত মনে করে এবং অন্য কেউ এটা না করলে তাকে কটাক্ষ করতে আরম্ভ করে, তাহলে এ কাজটিই বিদ'আত হয়ে যাবে।

'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা কখন বিদ'আত?

আমি তো এ পর্যন্ত বলি যে এক ব্যক্তির সামনে কোনো মজলিসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আলোচনা আরম্ভ হলো। আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মনে হলো যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার সামনে উপস্থিত আছে, এই চিত্র কল্পনা করে সে বলল,

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

তার অন্তরে হাজির-নাজিরের বিশ্বাস ছিল না। মানুষ দূরের জিনিসের বিষয়ে যেভাবে কল্পনা করে যে এটা আমার সামনে রয়েছে এ ক্ষেত্রেও সেরূপ কল্পনা করে এভাবে দরূদ পাঠ করায় কোনো দোষ নেই।

তবে যদি কোনো ব্যক্তি এই বিশ্বাস নিয়ে এভাবে দরূদ পাঠ করে যে রাসূল (সা.) এখানে এমনভাবে হাজির-নাজির আছেন, যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা হাজির-নাজির, তাহলে এটা শিরক হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ। আর যদি এ আক্বীদা নিয়ে না বলে, আর মনে করে যে, এভাবে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত এবং এভাবে দুরূদ পাঠ করা জরুরি। যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ পাঠ করবে না তার অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুহাব্বত নেই, তাহলে এ আমলই বিদ'আত ও গোমরাহী হয়ে যাবে।

আমলের সামান্য পার্থক্য :

আক্বীদা ও আমলের সামান্য পার্থক্যের কারণে একটি জায়েয কাজও নাজায়েয ও বিদ'আত হয়ে যায়। বেশির ভাগ বিদ'আত কাজ মৌলিকভাবে জায়েয। কিন্তু ফরজের মতো আবশ্যক করে নেওয়ার কারণে সেগুলো বিদ'আত হয়ে যায়।

ঈদের দিন কোলাকুলি করা কখন বিদ'আত?

ঈদের নামাযের পর দু'জন মুসলমান ভাই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পরস্পরে কোলাকুলি করা মৌলিকভাবে নাজায়েয কাজ নয়। কিংবা উদাহরণস্বরূপ এখন আপনি এই মজলিস থেকে উঠে কারো সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তাহলে এটা গোনাহের বিষয় নয় বরং জায়েয। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি এ কথা চিন্তা করে যে ঈদের নামাযের পর কোলাকুলি করা সুন্নাত, এটাও ঈদের নামাযের অংশ, কোলাকুলি না করলে ঈদ হলো না, তাহলে এই আমলই বিদ'আত হয়ে যাবে। কারণ এমন একটি কাজকে সুন্নাত সাব্যস্ত করা হলো যা নবী করীম (সা.) সুন্নাত সাব্যস্ত করেননি। সাহাবায়ে কেরামও এটাকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেননি এবং এর পাবন্দি করেননি। এখন যদি কেউ কোলাকুলি করতে অস্বীকার করে আর আপনি তাকে বলেন, আজ ঈদের দিন কেন কোলাকুলি করবেন না? তার অর্থ এই দাঁড়াল যে আপনি ঈদের দিন কোলাকুলি করাকে জরুরি সাব্যস্ত করলেন আর মনগড়াভাবে জরুরি সাব্যস্ত করাই এ কাজটিকে বিদ'আত বানিয়ে দিল। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি কোলাকুলি করতে মন চায় এবং কোলাকুলি করে তাহলে এটা মৌলিকভাবে বিদ'আত নয়। মোটকথা, কোনো জায়েয কাজকে জরুরি সাব্যস্ত করা বা সুন্নাত ও ওয়াজিব সাব্যস্ত করার দ্বারা তা বিদ'আত হয়ে যায়।

তাবলীগী নিসাব পাঠ করা কি বিদ'আত?

এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা তাবলীগী নিসাব পাঠ করার কারণে মানুষ তাদের ওপর আপত্তি করে যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরামের যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কে তাবলীগী নিসাব পাঠ করত? তাই এই তাবলীগী নিসাব পাঠ করা বিদ'আত। কিন্তু আমি আপনাদের সামনে যেই বিস্তারিত আলোচনা পেশ করলাম তাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইলম ও দ্বীনের কথা বলা এবং তার তাবলীগ করা সব সময়, সর্ব মুহূর্তে জায়েয। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জুমু'আর দিন আসরের পর এখানে সমবেত হই। দ্বীনের কথা শুনি, শোনাই। এখন যদি কেউ বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে

তো এমনটি হতো না যে মানুষ বিশেষভাবে জুমু'আর দিন আসরের পর সমবেত হতো এবং তাদের সামনে দ্বীনের কথা আলোচনা করা হতো। তাই আমাদের এই সমবেত হওয়াও বিদ'আত। খুব ভালো করে বুঝুন যে এটা বিদ'আত নয়, কারণ দ্বীনের তা'লীম ও তাবলীগ সব সময় জায়েয। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি বলতে আরম্ভ করে যে জুমু'আর দিন আসরের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদে এভাবে সমবেত হওয়াই সুন্নাত। কোনো ব্যক্তি যদি এতে অংশগ্রহণ না করে তাহলে তার মধ্যে দ্বীনের আগ্রহ নেই। তার অন্তরে দ্বীনের আযমত ও মুহাব্বত নেই। কারণ সে বায়তুল মোকাররমে জুমু'আর দিন আসে না। তাহলে এমতাবস্থায় আমাদের এ সমবেত হওয়ার আমল বিদ'আত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন। কোনো মানুষ যদি এখানে না এসে অন্য জায়গায় যায় এবং সেখানে গিয়ে দ্বীনের কথা শোনে তাহলে সেও সাওয়াবের কাজ করছে। এখন যদি কেউ তাকে বলে যে বায়তুল মোকাররমেই দ্বীনের কথা শোনার জন্য আসতে হবে, জুমু'আর দিনেই আসতে হবে, আসরের পরেই আসতে হবে, বয়ানও অমুক ব্যক্তিরই হতে হবে, তাহলে এর আমলটিই বিদ'আত হয়ে যাবে।

এমনিভাবে মানুষ তাবলীগী নিসাব পাঠ করে। দ্বীনি আমলের ফজীলত শোনায়। এটা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। এখন যদি কেউ নির্ধারিত করে বলে যে তাবলীগী নিসাব পাঠ করা জরুরি, এটাই সুন্নাত, এটা ছাড়া অন্য কোনো কিতাব পড়া হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলে এমতাবস্থায় এ তাবলীগী নিসাব পাঠ করাও বিদ'আত হয়ে যাবে। তাই যেকোনো জায়েয কাজ এবং সাওয়াবের কাজ মনগড়াভাবে নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আবশ্যক করা হলে সেটাই কাজটিকে বিদ'আত বানিয়ে দেয়।

সীরাতের আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করা :

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীরাত আলোচনা করা কত বড় সাওয়াবের কাজ। যে সময়গুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আলোচনা যেকোনো উপায়ে করা হবে, তা হবে জীবনের নির্যাস। মূল মূল্যবান সময় তো সেটাই, যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র আলোচনায় অতিবাহিত হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি এর জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করে, বিশেষ দিন নির্ধারণ করে বা বিশেষ মজলিস নির্ধারণ করে, আর বলে যে এই বিশেষ দিন ও পদ্ধতির মধ্যেই সাওয়াব সীমাবদ্ধ, তাহলে এ শর্তারোপ করাই এই জায়েয ও বরকতময় আমলটিকে বিদ'আত বানিয়ে দেবে।

দরূদ শরীফ পড়াও বিদ'আত হয়ে যাবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এই দরূদ শরীফ পাঠ করা শিখিয়েছেন। এই দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত। এখন যদি কোনো ব্যক্তি অন্য দরূদ শরীফ পাঠ করে যেমন এই দরূদ শরীফ পাঠ করল,

اللهم صل على محمد النبى الامى وعلى اله وصحبه وبارك وسلم

তাহলে এটাও জায়েয, গোনাহের কাজ নয়। এর দ্বারাও দরূদ শরীফ পড়ার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি বলে ওই প্রথম দরূদ শরীফ পাঠ করো না, এই দ্বিতীয় দরূদ শরীফ পাঠ করো। এটাই পাঠ করা সুন্নাত। তাহলে দরূদ শরীফ পাঠ করার এই ফজীলতপূর্ণ আমলটি বিদ'আত হয়ে যাবে।

দুনিয়ার কোনো শক্তি সুন্নাত সাব্যস্ত করতে পারবে না :

খুব ভালো করে বুঝুন! মানুষ যে বিদ'আতের প্রকার বের করেছে যে একটি বিদ'আতে হাসানা, আরেকটি বিদ'আতে সাইয়্যিআ। একটি ভালো বিদ'আত, আরেকটি মন্দ বিদ'আত। মনে রাখবেন! কোনো বিদ'আতই ভালো নয়। যেই পদ্ধতিকে রাসূলুল্লাহ (সা.), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরাম জরুরি সাব্যস্ত করেননি, সুন্নাত সাব্যস্ত করেননি, মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেননি, দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব সাব্যস্ত করতে পারে না। কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তা গোমরাহী হবে। কারণ এর অর্থ এটা হবে যে সাহাবায়ে কেরাম এ পরিমাণ দ্বীন বোঝেননি, যে পরিমাণ আমি বুঝেছি।

সারকথা : এই যে কিছু নতুন বিষয় এমন আছে, যাকে কেউ দ্বীনের অংশ মনে করে না। যেমন–এই বৈদ্যুতিক পাখা, বাতি, ট্রেন, উড়োজাহাজ ইত্যাদি, এসব জিনিস এ জন্য বিদ'আত নয় যে এগুলোকে কেউ দ্বীনের অংশ, আবশ্যকীয় এবং জরুরি মনে করে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দ্বীনের যেসব কাজ সম্পাদনের বিশেষ কোনো পদ্ধতি শিক্ষা দেননি, যেভাবে ইচ্ছা এসব কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে এসব কাজের জন্য নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করা হলে এবং সে পদ্ধতিকেই জরুরি ও আবশ্যক সাব্যস্ত করা হলে, তা বিদ'আত হয়ে যাবে। এ মূলনীতিটি মনে রাখলে এ বিষয়ে উদ্ভূত সকল প্রশ্ন ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিদ'আত থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন এবং দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস আল্লাহর জিকির-২

মুফতী শরীফুল আজম

মু'মিনের অন্তরে জিকিরের প্রতিক্রিয়া :
মানুষ আসলে আত্মার নাম। শরীরের নাম মানুষ নয়। আত্মার নাম মানুষ। আসল মানুষটিকে বহন করার জন্য শরীর একটি বাহন মাত্র। পার্থিব জগতে আত্মার বাহন বা পোশাক হচ্ছে শরীর বা দেহ। মঙ্গলগ্রহে যেতে হলে যেমন বিশেষ পোশাক রয়েছে, তদ্রূপ ইহজগতে মানুষের বিশেষ পোশাক হচ্ছে মানব দেহ। কবরের জগতে আবার এ পোশাকে যাওয়া যায় না। সেখানকার জন্য রয়েছে ভিন্ন পোশাক। আর পরকালে জান্নাত বা জাহান্নাম উভয় স্থানের জন্যও ভিন্ন পোশাক রয়েছে। আত্মার এই পোশাককে বলা হয় দেহ বা শরীর। দুনিয়ার দেহাবয়ব আমরা এক রকম দেখতে পাচ্ছি। কবরে এর ডিজাইন হবে ভিন্ন। আখেরাতের দেহ হবে মানুষের কল্পনাতীত।

তাই আসল মানুষ হচ্ছে ভেতরের অন্তরাত্মা। আত্মা যখন উড়ে চলে যায় আর দেহ পড়ে থাকে নিথর। তখন বলা হয় লোকটি চলে গেছে। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তার ইন্তেকাল হয়েছে। ওই দেহটাকে কেউ আর মানুষ মনে করে না। আসল মানুষ চলে গেছে। সবাই তা বুঝতে পারে। সেই আসল মানুষটিই হচ্ছে আত্মা বা কল্ব।

আল্লাহ তা'আলার যত আদেশ-নিষেধ রয়েছে তার প্রকৃত মুকাল্লাফ হচ্ছে আত্মা বা কল্ব। শরীয়তের সকল বিধি-বিধান নাযিল হয়েছে আত্মার ওপর। এ সকল হুকুম-আহকাম অনুসরণ করতে গিয়ে আত্মাগুলি তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আম্মারা, লাউওয়ামা, মুতমাইন্না। একেবারে অবাধ্য হলে তাকে বলা হয় আম্মারা। গোনাহ করে আবার অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে, আবারও অবাধ্য হয়, এভাবে চলতে থাকলে তাকে বলা হয় লাউওয়ামা। আর পূর্ণ অনুগত আত্মা হলো মুতমাইন্না।

ঠিক একইভাবে আমলের প্রতিদান বা কর্মফলও ভোগ করবে এই আত্মা। কবরে, হাশরে, মিজানে, পুলসিরাতে এবং সর্বশেষ জান্নাত বা জাহান্নামে এই আত্মাই হবে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত।

অন্যান্য হুকুমের মতো জিকিরের আদেশও করা হয়েছে আত্মার প্রতি। আত্মাকে জিকরে কাসীরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই জিকিরের প্রভাবও সবার আগে আত্মার ওপর প্রকাশ পায়। জিকিরের প্রভাবে প্রভাবিত হয় আত্মা। এরপর তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। কথা-বার্তা, চালচলন, উঠাবসা, লেনদেনসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় জিকিরের প্রভাব। ভালো হলে ভালো, খারাপ হলে খারাপ। এখানে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। জিকিরের প্রভাবে কারো অন্তর বিগলিত হয়, বিনম্র হয়। আবার এর বিপরীত কারো অন্তর রূঢ় ও কঠিন রূপ ধারণ করে। পাথরের মতো শক্ত হয়ে থাকে। কোনো প্রভাব-প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে না। পবিত্র কোরআনে উভয় প্রকার আত্মার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও খাঁটি মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে,

এক.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

অর্থ : মু'মিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয় তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে। (সূরা আনফাল-২)

দুই.

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا
أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٥)

আর সুংবাদ দাও বিনয়ীগণকে, যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভীত-কম্পিত হয়।...... (সূরা হজ্ব : ৩৪-৩৫)

তিন.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখো! আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। (সূরা রা'দ : ২৮)

চার.

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا
مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ
يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল

করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুনঃপুণ পঠিত। যারা তাদের পালনকর্তার মহত্ত্বে ভীত, কোরআন পাঠে তাদের দেহের লোম শিউরে ওঠে। এরপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়।...... (সূরা আল যুমার : ২৩)

পাঁচ.

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

যারা মু'মিন তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? ...... (সূরা আল হাদীদ : ১৬)

ছয়.

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শোনে তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন, এ কারণে যে তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব আমাদেরকেও মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। (সূরা আল মায়েদা : ৮৩)

এ সকল আয়াতের মাঝে মু'মিনের অন্তরে জিকিরের কয়েকটি প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা : وجلت - تطمئن
تقشعر- تلقين - تخشع - تفيض من الدم
ইত্যাদি।

এগুলোর শাব্দিক অর্থ যথাক্রমে,

وجلت : আঁতকে ওঠে, ভীত-কম্পিত হয়।

تطمئن : শান্তি পায়।

تقشعر : শিউরে ওঠে, রোমাঞ্চিত হয়, পশম দাঁড়িয়ে যায়।

تلين : বিনম্র হয়, ঝুঁকে পড়ে।

تخشع : বিগলিত হয়।

تفيض من الدمع অশ্রুসিক্ত হয়।

এ সবগুলোর অর্থ একত্র করলে অন্তরের এক বিশেষ অবস্থা ফুটে ওঠে। প্রথমত, এখানে وجل শব্দের মাঝে যে ভয়-ভীতির অবস্থা ব্যক্ত হয়েছে তার অর্থ সাধারণ ভয় নয়। যা হিংস্র জীব-জন্তু কিংবা শত্রুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যার দরুন মনের শান্তি চলে যায় এবং আতঙ্ক বিরাজ করে। বরং এখানে এমন ভয় উদ্দেশ্য, যা বড়দের মহত্ত্বের কারণে মনের মাঝে সৃষ্টি হয়। যার ফলে ভক্তি-শ্রদ্ধায় দেহ-মন বিগলিত হয়ে নিজেকে সেই মহত্ত্বের প্রতি সঁপে দেওয়ার মনোভাব তৈরি হয়।

অনুরূপ যাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর তাদের অন্তরে যখন আল্লহর স্মরণ জাগ্রত হয় তখন ভক্তিমাখা ভয়ে অন্তর আঁতকে ওঠে, শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে, আপাদমস্তক পুলকিত হয়। দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়। এভাবে চলতে চলতে অন্তর বিগলিত হয়ে নিজেকে আল্লাহর সামনে সঁপে দেয়, তাঁর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। একসময় নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গাল বেয়ে পড়তে থাকে। অশ্রুশিক্ত নয়নে, দুই হাত তুলে আল্লাহর দরবারে পেশ করতে থাকে প্রাণের আকুতি। এটা হচ্ছে জিকিরের ইতিবাচক প্রভাব। যার প্রশংসা খোদ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

পক্ষান্তরে অনেক অন্তর এমনও আছে, জিকির দ্বারা যা প্রকম্পিত হয় না। প্রশান্ত হয় না বা বিনম্র-বিগলিত হয় না। এমন পাষাণ হৃদয়ের আলোচনাও পবিত্র কোরআনে স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

এক.

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

অর্থ : যখন খাঁটিভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে ওঠে। (সূরা আল যুমার : ৪৫)

দুই.

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

অর্থ : যাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরের ব্যাপারে কঠোর তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। (সূরা আল যুমার : ২২)

উক্ত আয়াতে এমন পাষাণ হৃদয়ের অধিকারীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে যে আল্লাহর জিকির ও বিধানাবলি থেকে কোনো প্রভাব কবুল করে না। (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন)

তিন.

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ : অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মতো অথবা তদাপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়; অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। (সূরা আল বাকারা : ৭৪)

চার.

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থ : অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ-অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন,

যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনইভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ তাদের ওপর আজাব বর্ষণ করেন। (সূরা আল আন'আম : ১২৫)

অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর জিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং কুফর ও শিরকের কথাবার্তায় নিবিষ্ট হয়। (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন)

পাঁচ.

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

অর্থ : .... তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (সূরা আল হাদীদ : ১৬)

এ সকল আয়াতে অন্তরের অবস্থা ব্যক্ত করতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, اشمأزت — قست — قاسية — ضيقا حرجا ইত্যাদি।

এগুলোর শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপ,

اشمأزت : সংকুচিত হয়ে যায়। বিতৃষ্ণায় ভরে যায়।

قست : কঠিন হয়ে গেল, পাষাণ হয়ে গেল।

قاسية : আল্লাহর জিকির থেকে বিরত, পাষাণ হৃদয়।

ضيقا حرجا : অতি সংকীর্ণ।

এ সকল অর্থকে সমন্বয় করলে অন্তরের একটি বিশেষ অবস্থা ফুটে ওঠে, যা দুর্ভাগ্যজনক। আল্লাহ তা'আলার নাম শুনলে, তাঁর দেওয়া বিধানের আলোচনা হতে থাকলে একদল হতভাগা দুর্ভাগার হৃদয় বিরক্তি, বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়ে যায়। বিঃস্বাদে ভরে যায় তাদের মন। কখন উঠে পালাবে ওই মজলিস থেকে তার জন্য ছটফট করতে থাকে। জিকিরের আওয়াজে দম বন্ধ হয়ে আসে তাদের। এমন পাষাণ হৃদয়ে আল্লাহর স্মরণে কোনো প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। কঠিন অতি কঠিন, পাথরের চেয়ে কঠিন হয়ে যায়। এমন সংকীর্ণমনাদের কাছে আল্লাহর জিকির এবং তার আদেশ পালন আকাশে ওঠার মতো দুঃসাধ্য মনে হয়ে থাকে।

ফলে তারা নিজেরাও জিকির করে না এবং অন্যদের জিকির দেখতে পারে না। নানা অজুহাত, আপত্তি আর এশকালে ঘুরপাক খেতে থাকে। যেভাবে জিকির করাকে সে বৈধ মনে করে, সেভাবে নিজে জিকির করার তাওফিকও হয় না।

হাদীস শরীফের আলোকে জিকিরের প্রতিক্রিয়া :

১.

حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَفِى صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত মুতাররাফ (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবীজি (সা.)-এর নিকট এলাম। তিনি নামায পড়ছিলেন আর তাঁর বুকের ভেতর থেকে ডুকরে ডুকরে কান্নার দরুন শব্দ হচ্ছিল। (আবু দাউদ : ৯০৪, নাসায়ী : ১২১৪)

২.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ :قَالَ لِى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ عَلَىَّ، قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، آقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ :نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) (النساء : ٤١)، قَالَ :حَسْبُكَ الآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) আমাকে বললেন, আমার সামনে কোরআন তিলাওয়াত করে শোনাও! আমি বললাম, আপনাকে তিলাওয়াত করে শোনাব? অথচ কোরআন তো আপনার ওপরই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, শোনাও! অতএব আমি সূরা আন নিসা তিলাওয়াত করতে আরম্ভ করলাম। যখন এই আয়াতে পৌঁছালাম فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (আর তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রতিটি উম্মতের মধ্য হতে সাক্ষ্য প্রদানকারীকে ডেকে আনব (যিনি উম্মতের আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন, অর্থাৎ তাদের নবীকে ডেকে আনব) এবং আপনাকে ডাকব তাদের উম্মতের ওপর সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে। (সূরা আন নিসা : ৪১)

তখন নবীজি (সা.) বললেন, ব্যস,

এতটুকুই রাখো! অতঃপর আমি নবীজি (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর দু'নয়ন অশ্রু বর্ষণ করে চলছে। (বোখারী শরীফ : ৫০৫০)

৩.

حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِىُّ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَعَظَنَا، فَذَكَّرَ النَّارَ، قَالَ :ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِّبْيَانَ وَلَاعَبْتُ الْمَرْأَةَ، قَالَ :فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ :وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ نَافَقَ حَنْظَلَةُ فَقَالَ :مَهْ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ :وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ، فَقَالَ :يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً، وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِى الطُّرُقِ،

হযরত হানযালা (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মজলিসে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে নসিহত করলেন এবং জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি যখন ঘরে এলাম, তখন বাচ্চাদের সাথে এবং স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফুর্তি করলাম। (অর্থাৎ মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল) তিনি বলেন, এরপর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে দেখা হলে আমার অবস্থা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, তুমি যা বলছ, আমিও তা-ই করেছি। অতএব আমরা দুজন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে দেখা করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফিক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে। নবীজি (সা.) বললেন, কী হয়েছে? আমি বিষয়টি খুলে বললাম। আবু বকর (রা.) বলে উঠলেন, আমিও তার মতো একই কাজ করেছি। নবীজি (সা.) বললেন, সব সময় এক অবস্থা থাকে না। জিকিরের সময় তোমাদের কলবের যে অবস্থা থাকে যদি সর্বদা তা বিরাজমান থাকত, তবে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। এমনকি পথে পথে তোমাদেরকে সালাম প্রদান করত। (সহীহ মুসলিম : ২৭৫০)

৪.

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ :وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ :إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) বলেন, একদিন ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করলেন। এতে আমাদের চোখ অশ্রুসজল হলো, এবং অন্তর কেঁপে উঠল। এক ব্যক্তি বলে উঠল, নিশ্চয়ই এটা বিদায়ী নসিহত। কাজেই আমাদের কাছ থেকে কী অঙ্গীকার নিতে চান হে আল্লাহর রাসূল! নবীজি (সা.) বললেন, আমি তোমাদেরকে শেষ উপদেশ হিসেবে বলব, তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে। আমীরের কথা শুনবে এবং মানবে। যদিও সে হাবশী গোলাম হয়। আমার পর যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। সাবধান! নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে, কেননা তা গোমরাহী। তোমাদের মাঝে যে এমন পরিস্থিতির শিকার হবে তার জন্য আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশদীনের সুন্নাত আবশ্যক। মাড়ির দাঁত দিয়ে তাকে শক্ত করে কামড়ে ধরো। (তিরমিযী : ২৬৭৬)

৫.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ :إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ :إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ "

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য ছায়া থাকবে না।

(১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।

(২) এমন যুবক যে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির মাঝে বড় হয়েছে।

(৩) ওই ব্যক্তি, যার মন মসজিদে বাঁধা থাকে।

(৪) এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে। আল্লাহর জন্য একত্রিত হয় এবং পৃথক হয়।

(৫) ওই ব্যক্তি, যাকে বংশীয় সুন্দরী রমণী আহবান করে, আর সে উত্তরে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

(৬) ওই ব্যক্তি, যে সদকা করে এমনভাবে গোপন করে যে তার বাম হাত জানে না ডান হাত কী খরচ করল। (৭) ওই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর জিকির করে ফলে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। (বোখারী : ১৪২৩)

এ সকল হাদীসে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত বা আল্লাহর জিকিরের দরুন কলবে যে অবস্থা তৈরি হয় তা বিভিন্ন বাচনভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন–

এক.

ازيز المرجل ডেকচিতে পানি বলকানোর আওয়াজ।

ازيز الرحى কোনো জিনিস পেষার সময় যাঁতায় ঘর্ষণের আওয়াজ। অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াতের ফলে অন্তরে এমন অবস্থা তৈরি হয় যে আল্লাহর মুহাব্বতমাখা ভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না হতে থাকে। ঠিক জিকির করতে করতে অনেক সময় এমন ডুকরে কান্নার অবস্থা তৈরি হয়ে থাকে।

দুই.

كما تكون عند الذكر জিকিরের সময় কল্‌বের মধ্যে যে হালাত তৈরি হয় তা যদি সর্বদা বাকি থাকত তাহলে ফেরেশতারা এসে মুসাফাহা শুরু করে দিত। এটা ঈমানের এমনই শক্তিশালী ও আল্লাহর কাছে অতি প্রিয় একটি অবস্থা, যার দরুন ফেরেশতারাও প্রভাবিত হয়।

তিন.

ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب চোখে অশ্রু বইতে থাকা এবং অন্তর আঁতকে ওঠা বা চমকে ওঠা। এটা কল্‌বের একটি অবস্থা জিকির বা আখেরাতের স্মরণে। এ ধরনের অবস্থা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মনের ভেতর মুহাব্বতের ঢেউ খেলে। চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

চার.

ففاضت عيناه বুক ভাসানো কান্না। এটা কল্‌বের একটি চরম মজাদার অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নির্জনে বসে জিকির করতে করতে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা যখন হৃদয়ের মাঝে উথলে ওঠে, তখন বুকফাটা কান্না চলে আসে। এ সকল অবস্থা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই প্রিয়। তাই কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। এর জন্য বিভিন্ন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এর বিপরীত কঠোর হৃদয় যাতে জিকিরের প্রভাব পরিলক্ষিত না হয় বিভিন্ন ভাষায় তার তিরস্কার করা হয়েছে। মু'মিনদের হৃদয় যাতে এমন পাষাণ না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

ওয়াজ্‌দ এবং তাওয়াজুদ :

ওয়াজ্‌দ الوجد : কোনো আতঙ্ক, দুঃখ, পরোকালের কোনো দৃশ্য ভেসে ওঠা অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে কাশ্‌ফ হওয়ার দরুন কলবে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাকে ওয়াজ্‌দ বলা হয়। অথবা ওয়াজ্‌দ হচ্ছে কল্‌বের শ্রবণ এবং অন্তর্দৃষ্টির নাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

অর্থ : বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না; কিন্তু বক্ষ্যস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়। (সূরা হজ্ব : ৪৬)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

অর্থ : এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (সূরা ক্বাফ : ৩৭)

যার ওয়াজ্‌দ বা কল্‌বের অবস্থা দুর্বল হয় তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এটাকে التواجد বলা হয়। আর যার ওয়াজ্‌দ শক্তিশালী হয় সে স্থির ও শান্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুণঃপুণ পঠিত। যারা তাদের পালনকর্তার মহত্ত্বে ভীত, কোরআন পাঠে তাদের দেহের লোম শিউরে ওঠে। এরপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়।...... (সূরা আল যুমার : ২৩)

আল্লামা ইমাম নববী (রহ.) বলেন, ওয়াজ্‌দ হলো, ভেতরে জন্মানো এক উত্তাপ, যা চরম আকাঙ্ক্ষা থেকে তৈরি হয়। ওয়াজ্‌দের ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুশিতে বা বেদনায় উদ্বেলিত হয়।

অনেকের মতে, ওয়াজ্‌দ হলো ক্ষণস্থায়ী, ক্ষয়শীল আর মা'রেফাত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে স্থায়ী, যা কখনো দূর হয় না। কারো কারো মতে, ওয়াজ্‌দ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুশাহাদার স্তরে উন্নীত হওয়ার সুসংবাদ।

ওয়াজ্‌দের সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি শব্দ হলো الغلبة (গালাবাহ)। এটা এমন এক অবস্থার নাম, যে অবস্থায় বিচার-বুদ্ধি ঠিক থাকে না এবং শিষ্টাচার বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পরিণতি কী হতে পারে তার হিতাহীত জ্ঞান থাকে না। অনেক সময় এমন এমন কাজ করে। অচেনা মানুষ যা ভালোভাবে নেয় না। এই অবস্থা দূর হয়ে গেলে পরক্ষণে আবার নিজে নিজেই লজ্জিত হয়। গালাবার অবস্থা বিভিন্ন কারণে তৈরি হতে পারে। যেমন–ভয়, আতঙ্ক, ভক্তি বা লজ্জা ইত্যাদি।

যেমন হাদীস শরীফে আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনজির (রা.)-এর ঘটনা উল্লেখ হয়েছে। বনু কুরায়জার বিষয়ে ফায়সালা করার জন্য যখন নবীজি (সা.) হযরত

সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর মধ্যস্থতা মেনে নিয়েছিলেন, তখন বনু কুরায়জা তাদের মিত্র হযরত আবু লুবাবার কাছে পরামর্শ চাইল। তিনি হাত দিয়ে নিজ গলায় ইশারা করে বোঝালেন যে তার মধ্যস্থতা তোমরা মেনে নিলে সে তোমাদেরকে কতল করার সিদ্ধান্ত দেবে।
এই পরামর্শের দরুন হযরত আবু লুবাবা (রা.) খুব অনুতপ্ত হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কাজেই তৎক্ষণাৎ তিনি ফিরে গেলেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে রাখলেন। আর বলেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমি এ অবস্থায়ই থাকব।
এটাই হচ্ছে গালাবা। যখন আল্লাহ তা'আলার ভয় তার ওপর প্রবল হলো তখন সেটা নবীজি (সা.)-এর কাছে হাজির হওয়ার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াল। অথচ ওই মুহূর্তে তার কর্তব্য ছিল নবীজি (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া। যেমনটি পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
অর্থ : আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের ক্ষমা করে দিতেন, অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। (সূরা আন নিসা : ৬৪)
তা ছাড়া শরীয়তে তো খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার কোনো বিধান নেই।
নবীজি (সা.) তখন বললেন, সে যদি আমার কাছে আসত তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করিয়ে নিতাম। এখন সে যা করেছে এ অবস্থায় আমি তার বাঁধন খুলতে পারব না। যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার খাঁটি তাওবা কবুল করে ক্ষমা করে আয়াত অবতীর্ণ করে দিলেন, এরপর নবীজি (সা.) তার বাঁধন খুলে মুক্ত করলেন।
এ ঘটনায় হযরত আবু লুবাবা (রা.)-এর ওপর যখন ভয়ের গালাবা হলো তখন তিনি হিতাহীত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। অথচ বুদ্ধিমানের কাজ ছিল ইস্তিগফার করা এবং রাসূলের (সা.) মধ্যস্থতায় ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেটা উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
তা ছাড়া এখানে শিষ্টাচার বা আদব রক্ষাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখানে শিষ্টাচারের দাবি ছিল যার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে বলে তিনি ভেবে ছিলেন, অর্থাৎ নবীজি (সা.), সরাসরি তাঁর কাছে এসে নিজের ভুল স্বীকার করা। কিন্তু গালাবার হালতের কারণে তিনি এগুলো না করে পাগলের মতো আচরণ করেছেন। খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন। এটাকেই বলে গালাবা। ভয়ের গালাবা।
অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর একবার গালাবার হালত সৃষ্টি হয়েছিল। যেটা ছিল দ্বীনের মর্যাদা রক্ষার গালাবা। হুদাইবিয়ার বছর যখন নবীজি (সা.) মুশরিকদের সাথে সন্ধি করতে যাচ্ছিলেন তখন হযরত ওমর (রা.)-এর মাঝে গালাবার অবস্থা দেখা দেয়। তিনি নবীজি (সা.)-এর ওপর আপত্তি করে বসেন। তিনি দৌড়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে জেরা করেন।
ওমর : তিনি কি আল্লাহর রাসূল নন?
আবু বকর : হ্যাঁ, অবশ্যই।
ওমর : আমরা কি মুসলমান নই?
আবু বকর : হ্যাঁ, অবশ্যই।
ওমর : ওরা কি মুশরিক নয়?
আবু বকর : হ্যাঁ, অবশ্যই।
ওমর : তাহলে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে নতি স্বীকার করব?
আবু বকর : তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নাও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল।
ওমর : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল।
এরপর হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর গালাবা আরো প্রবল হলো। তিনি এবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে অনুরূপ প্রশ্ন করলেন, যা আবু বকর (রা.)-এর কাছে করেছিলেন। নবীজি (সা.) তাঁকে সেই একই উত্তর দিলেন, যা আবু বকর (রা.) দিয়েছিলেন।
সর্বশেষ নবীজি (সা.) বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। কিছুতেই আমি তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারব না এবং কক্ষণো তিনি আমাকে ধ্বংস করবেন না।
এ ঘটনার পর হযরত ওমর (রা.) বলতেন, আমি সেদিন যে আচরণ করেছি এবং যে উচ্চবাক্য করেছি তার প্রায়শ্চিত্যস্বরূপ লাগাতার রোজা, সদকা, দাসমুক্তি এবং নামায আদায় করতে থাকব, যতক্ষণ না কল্যাণের আশা করতে পারি।
অনুরূপভাবে একবার গালাবার হালতের কারণে হযরত ওমর (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়ায় নবীজি (সা.)-এর ওপর আপত্তি করে বসেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি ঘুরে নবীজি (সা.)-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কী করে তার জানাযা পড়াবেন, অথচ সে বিভিন্ন সময় বহু মন্তব্য করেছে। নবীজি (সা.) বললেন, ওমর আমার সামনে

থেকো সরে যাও। আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে বলেই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই বলে তিনি জানাযা পড়ালেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এমন দুঃসাহসিকতা প্রদর্শনের ফলে আমি বিস্মিত হয়েছি।

ঠিক একই ধরনের গালাবার ঘটনা ঘটেছিল হযরত আবু তাইবা (রা.)-এর ক্ষেত্রে। নবীজি (সা.) একবার শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। তখন হযরত আবু তাইবা (রা.) ওই রক্ত পান করে ফেললেন। অথচ এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ। কিন্তু তিনি গালাবার হালতে এটা করে ফেলেছিলেন। নবীজি (সা.) তাঁর এই অপারগতা মেনে নিলেন এবং বললেন, তুমি কিছু প্রতিবন্ধকের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেলে।

এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে, যাতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে গালাবার অবস্থা একটি স্বীকৃত বিষয়। এমন অবস্থাতে যা বৈধ হয় তা সাধারণ শান্ত অবস্থায় বৈধ নয়। আর গালাবার চেয়ে শান্ত অবস্থার মর্তবা বেশি। যেমন ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) (আত তা'আররুফ লি মাযহাবী আহলিত তাসাউফ, আবু বকর কিলাবাযী : ১/১১২-১১৭)

শায়খ আবুল কাসেম বলেন, অনেকের মতে ওয়াজ্দ হচ্ছে এমন অবস্থা, যা অকৃত্রিম এবং ইচ্ছাবহির্ভূতভাবে তৈরি হয়ে থাকে। সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, الوجد لهيب

কারো মতে, ওয়াজ্দ হচ্ছে, প্রেমাস্পদের মৃদু হাওয়ার অনুভূতি। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

কারো মতে, ওয়াজ্দ হচ্ছে প্রেমের আগুন, যা প্রজ্বলিত করে পবিত্র বায়ু। (শরহুত তিবী আলা মেশকাতিল মাসাবীহ, শরফুদ্দীন তীবী : ৬/১৮০৩)

হযরত বারীরা (রা.)-এর ঘটনায় তার স্বামীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে তাঁর স্ত্রীর পেছনে পেছনে ছুটে বেড়াতেন আর তার প্রেম বিরহে অশ্রু ঝরাতেন। এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে ভালোবাসা লজ্জা-শরমকে দূর করে দেয়। যে ব্যক্তি এমন পরিস্থিতির স্বীকার হয় তাকে অপারগ বা মাজুর বলে ধরে নিতে হবে, যদি তার অনিচ্ছায় এ ধরনের আচরণ প্রকাশ পায়।

অতএব আল্লাহর প্রেমে আসক্ত ব্যক্তি আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসার কোনো আলোচনা শুনে যখন ওয়াজ্দের অবস্থায় চলে যায় এবং অনিচ্ছায় অস্বাভাবিক কোনো আচরণ করে বসে যেমন লম্ফঝম্ফ, ছোটাছুটি ইত্যাদি তাহলে তাদেরকে মাজুর বা অপারগ বলে ধরে নিতে হবে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় ইচ্ছাকৃত নাচানাচি করা বা তালি বাজানো–এটা ফাসেকদের কাজ। আল্লাহকে যারা ভালোবাসে এবং ভয় করে তাদের কাজ নয়। (সুবুলুস সালাম : ২/১৯২)

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস– নবীজি (সা.) নামায পড়াকালীন তাঁর সীনা মোবারক থেকে ডেকচির আওয়াজের মতো ডুকরে কান্না করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা হাররানী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীস এবং এ ধরনের আরো যত হাদীস রয়েছে এর ভিত্তিতে মাশায়েখে তরীকত ওয়াজ্দ এবং তাওয়াজুদের প্রচলন ঘটিয়েছেন। নবীজি (সা.)-এর মাঝে এই অবস্থা তৈরি হতো মূলত আল্লাহ তা'আলার সিফাতে জালালী ও জামালীর সমন্বিত বহিঃপ্রকাশের সময়। অর্থাৎ সিফাতে জালাল ও সিফাতে জামালের সাথে মিশ্রিত হয়ে প্রকাশ পেত। অন্যথায় জামালের মিশ্রণ ছাড়া শুধু সিফাতে জালাল সহ্য করার সক্ষমতা কারো মাঝে নেই; বরং কুল মাখলুকাতের কারো মাঝেই নেই। কাজেই নবীজি (সা.)-এর কলবে যখন সিফাতে জামালের বহিঃপ্রকাশ ঘটত তখন নূর, আনন্দ, উৎফুল্ল, প্রশান্তি এবং প্রফুল্লে মন ভরে যেত। তাঁর উম্মতের প্রত্যেক উত্তরসূরির জন্য এই দুই প্রকার তাজাল্লির মাঝে অংশ রয়েছে। (দলীলুল ফালেহীন : ৪/৩৬৬)

সাহাবায়ে কেরাম ওয়াজ্দের সময় সাধারণত প্রশান্ত অবস্থায় থাকেন, এর ব্যতিক্রম খুব কমই হতো। যেমন হযরত ইবরাজ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এমন হৃদয়কাড়া নসিহত করেছেন যে এতে আমাদের নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়েছে এবং অন্তর কেঁপে উঠেছে। এটা ছিল তাঁদের নীরব ওয়াজ্দ। নবীজি (সা.)-এর মজলিসে সর্বদা নীরব থাকার অভ্যাস এবং সবরের চাদর দিয়ে ঢেকে থাকার বরকতে সামা'আ-এর প্রভাব তাদের ওপর প্রবল হতে পারত না। এ হাদীসে আমাদের জন্য এ কথায় শিক্ষা রয়েছে যে কানে যা শ্রবণ করে তার দ্বারা অন্তর প্রভাবিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই অবস্থাকে গোপন করা, শান্ত থাকা এবং কোনো প্রকার নড়াচড়া বা চিৎকার না করা বাঞ্ছনীয়।

অতএব যারা নবীজি (সা.)-এর সুন্নাত অনুসরণকারী ওয়াজ্দের ক্ষেত্রে তাদের জন্য আবশ্যক হলো ওয়াজ্দের সকল প্রকার অবস্থা, যা অন্য কেউ অনুভব করতে পারে না, সেগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করে চুপ থাকা, শান্ত থাকা, নবীজি (সা.) তাঁর মজলিসে উপস্থিত লোকদের এই শিক্ষাই দিতেন। কাজেই আমরাও তা অনুসরণের চেষ্টা করব। (দলীলুল ফালেহীন : ৪/৩৬৩)

খাদ্য ও পানীয়ের শরঈ নীতিমালা-৬

মুফতী মাহমুদ হাসান

মিশ্র খাদ্যের শরঈ বিধান

বর্তমান বাজারে এমন অনেক খাবার পাওয়া যায়, যা এককভাবে একটি উৎস থেকে তৈরি করা হয় না; বরং তা প্রাণী, কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ, উদ্ভিদ, অ্যালকোহল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার একাধিক উৎসের উপকরণসমৃদ্ধ হয়। যাকে 'মিক্সড ফুড' তথা মিশ্র খাদ্য বলা হয়। আর কোনো খাদ্যপণ্যকে হালাল বা হারাম বলতে হলে সংযোজিত উপকরণের ভিত্তিতে নয়; বরং উপকরণের উৎসের হালাল-হারামের ভিত্তিতেই বলতে হবে। হারাম বস্তুর কারণ ভিন্ন হওয়ায় তার মিশ্রণের হুকুমও পরিবর্তন হবে। হারাম বস্তুর হারাম হওয়ার কারণ অনুপাতে মিশ্র খাদ্যদ্রব্যের হুকুম নিম্নরূপ :

১. যদি কোনো খাদ্যপণ্যের মধ্যে এমন নাপাক বস্তু মেশানো হয়, যা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নাপাক তাহলে পূর্ণ খাবার নাপাক হয়ে যাবে, চাই নাপাকির পরিমাণ কম হোক বা বেশি–মিশ্রণ করা যেমন জায়েয নেই, তেমনি নাপাক বস্তু মিশ্রিত খাবার খাওয়াও বৈধ নয়। এমনকি তার বাহ্যিক ব্যবহার তথা এজাতীয় নাপাক বস্তুর মিশ্রণে তৈরি প্রসাধনী ব্যবহার করাও জায়েয নয়। তবে নাপাকির পরিমাণ কম হলে তা বিক্রয় অথবা পশু-পাখিকে খাওয়ানো জায়েয হবে। (আলমুহীতুল বুরহানী ৬/৩৫১)

২. যদি কোনো এমন বস্তু, যা ক্ষতিকর হওয়ার কারণে হারাম, তা কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ করা হয়, তবে তার ক্ষতিকর দিক যদি পূর্ববৎ বহাল থাকে, তাহলে উক্ত হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যাবে। আর যদি মিশ্রণের কারণে তার ক্ষতি দূর হয়ে যায় তবে তা খাওয়া জায়েয। (রদ্দুল মুহতার ৬/৪৫৭)

৩. যদি কোনো এমন বস্তু, যা সম্মানিত হওয়ার কারণে খাওয়া হারাম, যেমন মানব শরীরের কোনো অংশ যদি কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ করা হয়, তবে উক্ত মিশ্রণ অল্প হোক বা বেশি–উক্ত হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যাবে। (আলবাহরুর রায়েক ১/২৪৩)

৪. যদি কোনো এমন বস্তু, যা নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত হওয়ার কারণে খাওয়া হারাম, তা যদি কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে এমনভাবে মিশ্রণ করা হয়, যা সম্পূর্ণ মিশে খাবারটিও ঘৃণ্য হয়ে যায় তাহলে ওই খাবার খাওয়াও হারাম হবে। আর ঘৃণিত ও হারাম বস্তু খাদ্যের সাথে এভাবে মেশানোও বৈধ নয়। তবে অনিচ্ছায় খাবারের পাত্রে মশা-মাছি, পিঁপড়া, পোকামাকড় ইত্যাদি পড়ে গেলে ওই খাদ্য হারাম হয় না বিধায় পোকামাকড় ফেলে দিয়ে বাকি খানা খাওয়া যাবে। (ফাতহুল কদীর ১/৮৪)

৫. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ 'নেশা' হয়, তবে দেখতে হবে যে উক্ত বস্তু কি তরল নাকি শুষ্ক? যদি উক্ত নেশাকর বস্তুটি তরল না হয়ে বরং শুষ্ক হয়, তবে কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণের পর যদি তার নেশার প্রভাব দূর হয়ে গিয়ে থাকে, তবে উক্ত হালাল বস্তু খাওয়াও জায়েয হবে। আর যদি উক্ত নেশার বস্তুটি তরল হয়, তবে দুই ধরনের হতে পারে–

ক. আঙ্গুর বা খেজুর দ্বারা তৈরীকৃত চার প্রকার হারাম পানীয়ের কোনো একটি হলে উক্ত হালাল বস্তুটিও হারাম হয়ে যাবে। চাই মিশ্রণ অল্প পরিমাণে হোক বা বেশি পরিমাণে এবং মিশ্রণের পর তাতে নেশার প্রভাব অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক।

খ. যদি তরল নেশার বস্তুটি আঙ্গুর বা খেজুরের না হয়, তাহলে শুষ্ক নেশাদ্রব্যের মতোই তার হুকুম হবে, অর্থাৎ মিশ্রণের পর যদি নেশার প্রভাব অবশিষ্ট থাকে তাহলে হারাম হবে, অন্যথায় হালাল হবে। (আত্তাজরীদ ১২/৬০৯০)

৬. যদি কোনো নাপাক, ঘৃণ্য বা নেশাকর বস্তু হালাল বস্তুর সাথে এমনভাবে মিশে যায় যে, তার চিহ্নও বাকি থাকে না এবং তার মূল প্রকৃতি পরিবর্তন শরঈভাবে সাব্যস্ত হয়ে এগুলোর সব গুণাগুণ দূর হয়ে যায়, তাহলে ওই খাদ্য হালাল হবে। (মাজমাউল আনহুর ১/১৬১, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ৩/১৭৭)

বস্তুর মূল প্রকৃতি পরিবর্তনে বিধানে পরিবর্তন :

কোনো বস্তুর মূল প্রকৃতি পরিবর্তনের দ্বারা তার বিধানেও পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই কোনো হারাম বস্তুর মূল প্রকৃতি

পরিবর্তনের দ্বারা তা হালাল বস্তুতে পরিণত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেবল নাম পরিবর্তন বা আকার-আকৃতির পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, বরং ওই বস্তুর মৌলিক গুণাগুণ ও স্বভাব-প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে যেতে হবে। যেমন : নাপাক মদ 'সিরকা'য় রূপান্তরিত হয়ে গেলে এবং মৃগনাভির রক্তকে 'মিশক'-এ রূপান্তরিত করা হলে পাক হয়ে যায়। তদ্রূপ লবণের স্তূপে মৃত গাধা পড়ে লবণে পরিণত হয়ে গেলে পাক হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও ফোকাহায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানি (রহ.) (হেদায়া গ্রন্থকার) লেখেন–

وإذا تخللت الخمر حلت، سواء صارت خلا بنفسها أو بشىء يطرح فيها (الهداية ٤/٣٩٨)

আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহ.) লেখেন–

(قوله :لانقلاب العين) علة للكل، وهذا قول محمد، وذكر معه فى الذخيرة والمحيط أبا حنيفة حلية .قال فى الفتح :وكثير من المشايخ اختاروه، وهو المختار؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفى الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل؟ فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح .ونظيره فى الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهى نجسة وتصير مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها .اهـ.(رد المحتار١/٣٢٧)

তবে এখানে উল্লেখযোগ্য দুটি শর্ত হলো :

১. তার পরিবর্তনটি ফোকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় শরঈভাবে গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন হতে হবে, শুধু রাসায়নিক পরিবর্তন বিধান পরিবর্তনে যথেষ্ট নয়। কেননা গোশত রান্নার ফলেও রাসায়নিক পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়, অথচ শরঈ পরিভাষায় তার মূল পরিবর্তন সাব্যস্ত হয় না।

২. পরিবর্তনটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। তাই কোনো নিশ্চিত নাপাক বস্তুর কেবল স্বভাব-প্রকৃতির সন্দেহযুক্ত পরিবর্তন হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং পূর্বের ন্যায় নিশ্চিতভাবে হালাল প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হতে হবে। আর তা অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ ও বাছ-বিচারের মাধ্যমে উপলব্ধি হয়ে থাকে। তাই যেকোনো জিনিসের স্বভাব-প্রকৃতির পরিবর্তন হওয়ার সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়া ও ভাসাভাসা জানাশোনা যথেষ্ট নয়, বরং এতে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ পূর্বশর্ত। যেমন 'জেলেটিন' অধিকাংশ প্রাণীর হাড় ইত্যাদি থেকে তৈরি করা হয়, আর তৈরিকারীগণ অধিকাংশ ইউরোপ-আমেরিকার অমুসলিমগণ হয়ে থাকে, যাদের কাছে পশু জবাইয়ের শরঈ পদ্ধতির গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই ব্যাপকভাবে 'জেলেটিন' মৃত জন্তুর হাড় থেকেই বানানো হয়ে থাকে। আর মৃত জন্তুর হাড়ে তৈলাক্ত অবশিষ্ট না থাকলে তা পাক বলে গণ্য হলেও খাওয়া হালাল নয়। হালাল হওয়ার একমাত্র পদ্ধতি হলো হাড়ের মূল প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। কিন্তু হাড়ের মূল প্রকৃতি পরিবর্তন হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হলে ওই প্রডাক্ট হারামই থেকে যাবে, হালাল হবে না। কেননা এ হাড়ের মূল হলো হারাম, আর মূল প্রকৃতিতে পরিবর্তনের বিষয়টি সন্দেহজনক। (কিতাবুল হুজ্জাতি আলা আহলিল মাদীনাহ ৪/৯৭)

খাদ্যদ্রব্যে ই-কোড সম্পর্কিত শরঈ বিধান :

বর্তমান বাজারে প্যাকেটজাত যেসব পণ্য পাওয়া যায়, তার অনেকটির লেবেলে উপাদান অংশতে কিছু 'ই-কোড' (E-code) বা 'ই-নম্বর' দেওয়া থাকে। এই 'ই-কোড'-এর ব্যাপারে বিভিন্ন বিপরীতমুখী বক্তব্য প্রচলিত রয়েছে। যেমন, কারো কারো মতে, 'ই-কোড'গুলো শূকরের নির্দেশ করে। অর্থাৎ 'ই-কোড' মানেই হলো, সংশ্লিষ্ট খাদ্যপণ্যে শূকরের কোনো না কোনো অংশ মিশ্রণ করা হয়েছে, তাই খাদ্যপণ্যটিও নাপাক বিবেচিত হবে এবং তা খাওয়া হালাল হবে না!

তবে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, ই-কোড মৌলিকভাবে শূকরের নির্দেশ করে না, বরং ই-কোডের বাস্তবতা সম্পর্কে যে তথ্যাবলি সামনে এসেছে, তা হলো আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী উৎপাদনকারীর জন্য প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রবের গায়ে বেশ কিছু বিষয়ের তথ্য প্রদান করা জরুরি। ই-কোড মূলত European Economic Community (EEC) কর্তৃক স্বীকৃত খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বিশেষের (রাসায়নিক বা প্রাকৃতিক খাদ্যের অংশ, রং, স্বাদ, বা রুচি বাড়ানোর উপাদান) নির্দেশিকা, যা নির্দিষ্ট কোড বা নম্বর দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক ভাষার বিভিন্নতার দরুন প্যাকেটের গায়ে খাদ্যপণ্যের একটি নির্দিষ্ট নাম সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য। এ অবস্থায় ভাষার বিভিন্নতায় খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বুঝতে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে খাদ্য সংযোজন দ্রব্যগুলোকে–যা সাধারণত প্যাটেকজাত খাবারের মধ্যে অধিকাংশ সময় ব্যবহার

করা হয়ে থাকে–নাম না লিখে ই-কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কেননা কোড বা নম্বর সব ভাষাভাষী মানুষই বুঝতে সক্ষম। প্রাথমিক পর্যায়ে ই-কোড নির্ধারণ করত European Economic Community (EEC)। পরবর্তীতে এর দায়িত্ব গ্রহণ করে Codex Alimentarius Commission। তাই এটি হলো জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গঠিত কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশন কর্তৃক খাদ্য, খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্যবিষয়ক নির্ধারিত বা স্বীকৃত মান, ব্যবহারবিধি, নির্দেশনা এবং অন্য সুপারিশসম্বলিত সমন্বিত খাদ্য কোড। বাংলাদেশেও Codex Alimentarius Commission-এর 'কোডনীতি' অনুসরণ করা হয়। কাজেই প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের গায়ে ই-কোড লেখার বিষয়টি বাংলাদেশেও স্বীকৃত।

'ই-কোড' মৌলিকভাবে খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বোঝায়। এখন জানতে হবে যে এই খাদ্য সংযোজন দ্রব্যগুলোর 'উৎস' কী? কেননা, উৎস হালাল হলে সংশ্লিষ্ট সংযোজিত দ্রব্যও হালাল হবে, আর উৎস হারাম হলে সংযোজিত দ্রব্যও হারাম হবে। কাজেই ই-কোডের ভিত্তিতে খাদ্যপণ্যের হালাল ও হারাম নির্ধারণের জন্য ই-কোড নির্দেশিত উপাদানের উৎস সম্পর্কে জানা আবশ্যক!

ই-কোডের শ্রেণিবিভাগ :

ই-কোডের খাদ্য উপকরণগুলো তিন ধরনের উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়। যথা–

১. প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত। যেমন–গাছ, লতাপাতা, শস্য ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়, যা পরবর্তীতে উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাবারে ব্যবহার করা হয়।

২. রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত। প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ই-কোডগুলো অনেক সময় ব্যয়বহুল হওয়ায় পরবর্তীতে কিছু রাসায়নিক উপাদান থেকে গ্রহণ করা হয়।

৩. প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত। প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়, যা পরবর্তীতে উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাবারে ব্যবহার করা হয়।

বলাবাহুল্য যে, যে সকল ই-কোডের উৎস প্রাকৃতিক কোনো উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক কোনো হালাল পদার্থ, সেই ই-কোডগুলো তার উৎসের ভিত্তিতে 'হালাল' নির্দেশ করবে, কাজেই ব্যাপক অর্থে 'সকল ই-কোডই হারামের নির্দেশ করে'–এ দাবি বাস্তবতার আলোকে সঠিক নয়। উৎসের ভিত্তিতে হালাল ও হারামের নির্দেশক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত ই-কোডকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি–

এক. হালাল, যে সকল ই-কোড নিশ্চিতভাবে উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক হালাল বস্তু থেকে আহরিত উপাদানের নির্দেশ করে।

দুই. হারাম, যে সকল ই-কোড নিশ্চিতভাবে হারাম প্রাণিজ উৎস থেকে আহরিত উপাদানের নির্দেশ করে।

তিন. মাশবূহ (যাতে হালাল-হারাম কোনোটাই স্পষ্ট নয়), যে সকল ই-কোডের উপাদানের উৎসে দ্বিমুখী সম্ভাবনা আছে যে, তা উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক হালাল বস্তু থেকে আহরিত হতে পারে, আবার প্রাণিজ উৎস থেকেও আহরিত হতে পারে। এই ই-কোডগুলো হালাল বা হারামের নির্দেশক হওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। আর খাদ্যপণ্যের মধ্যে যেহেতু গোশত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শরীয়তের মূল হুকুম হলো হালাল হওয়া, কাজেই সে মূল হুকুমের ভিত্তিতে মাশবূহ ই-কোডযুক্ত খাবার খাওয়া জায়েয হবে। তথাপি যেহেতু অস্পষ্টতা আছে, তাই তাকওয়া-পরহেজগারির দাবি ও উত্তম হলো পারতপক্ষে এজাতীয় মাশবূহ ই-কোড থেকেও বেঁচে থাকা। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি তা ক্রয় করে কিংবা খায়, তবে তা ক্রয় করা এবং খাওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না যায়। এ ব্যাপারে ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য ফাতাওয়া গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে শামী' (১/১৫১)-তে উল্লিখিত আছে :

فى التاتارخانية :من شك فى إنائه أو فى ثوبه أو بدن أصابته نجاسة أو لا فهو طاهر ما لم يستيقن، وكذا الآبار والحياض والجباب الموضوعة فى الطرقات ويستقى منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار؛ وكذا ما يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والأطعمة والثياب اهـ ملخصا .(رد المحتار ١٥١/١)

সুতরাং 'মাশবূহ' ই-কোডের হুকুম হলো গবেষণা এবং তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ অস্পষ্টতা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে। অস্পষ্টতা দূর হয়ে গেলে সেটাকে হালাল বা হারামের নির্দেশক আখ্যা দেওয়া হবে।

হারাম ই-কোডের তালিকা :

ই-কোডের তালিকা বেশ দীর্ঘ, যা প্রায় পাঁচশতের নিকটবর্তী। এর মধ্যে অধিকাংশ কোড হালাল নির্দেশক, আর অনেকটি রয়েছে 'মাশবূহ' তথা সন্দেহযুক্ত, আর কিছু হারামও রয়েছে।

তাই আমরা আন্তর্জাতিক মানের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যথা : Sauth African national halal authority (SANHA), Halal foundation Pakistan, International halal certification (IHC) Pakistan সহ আরো কিছু গবেষণাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে সংক্ষিপ্তাকারে শুধু হারাম ই-কোডের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করছি। হারাম ই-কোডগুলো (যা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য) নিম্নরূপ–

E111, E120, E140, E141, E161b, E161g, E161i, E161j, E252, E428, E430, E431, E441, E485, E542, E630, E631, E632, E633, E634, E635, E640, E904, E920, E921, E951, E999, E1105, E1203, E1209, E1510, E1519

উল্লেখ্য যে, উক্ত তালিকা থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় স্মরণে রাখতে হবে :

ক. হালাল খাদ্যবিষয়ক বিশ্বে একাধিক নির্ভরযোগ্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর গবেষণা ও সিদ্ধান্তে পরস্পরে কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোতে সতর্কতার ওপর আমল করা উচিত।

খ. উল্লিখিত হারাম ই-কোডগুলোর মধ্য হতে কিছু ই-কোডের ব্যাপারে উৎসের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব গবেষণা অনুযায়ী কেউ কেউ 'মাশবূহ'-এর মত ব্যক্ত করেছেন। তাই সতর্কতামূলক হারাম হওয়ার মতটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

গ. তালিকাভুক্ত কিছু কোডের ব্যাপারে উপাদান ও উৎসের পরিবর্তনের কারণে বিধানগত পরিবর্তন হতে পারে।

(ই-কোডসংক্রান্ত কিছু তথ্য মাসিক আল-আবরার রবিউস সানি ১৪৪২ হি.-এর "হালাল খাদ্য ও ই-কোড সম্পর্কিত শরঈ বিধান"- মুফতী মনসূরুল হক সাহেব (দা.বা.) লিখিত প্রবন্ধ থেকেও নেওয়া হয়েছে।)

হালাল-হারামের ব্যাপারে খবরসমূহের বিধান :

আজকাল মানুষের মুখে মুখে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন খাবারের ব্যাপারে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, অমুক খাবার হারাম, কিংবা এর সাথে অমুক হারামদ্রব্য মিশ্রণ করা হয়ে থাকে ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো, এসব খবরের ওপর নির্ভর করা যাবে কি না? যখন কোনো খাবারের ব্যাপারে হালাল ও পবিত্র অথবা হারাম ও অপবিত্রতার খবর শোনে তখন তার ওপর কি ওই খবর অনুসারে আমল করা অপরিহার্য, নাকি উত্তম? আর কখন-ই বা সে খবর প্রত্যাখ্যান করবে? এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

শরীয়তে খবর গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে বিধানে বিভিন্নতা রয়েছে। এ বিভিন্নতার কারণ হলো খবরের পর্যায়ের ভিন্নতা। যেকোনো খবরের ক্ষেত্রে শরীয়ত তিনটি মৌলিক বিষয়ে দেখে থাকে :

এক হলো, খবর প্রদানকারীর ব্যক্তিগত অবস্থা, অর্থাৎ সে মুসলিম না অমুসলিম, সৎ নাকি অসৎ, সাবালক ও বুদ্ধিসম্পন্ন নাকি বিবেকহীন এবং গোলাম নাকি আজাদ ইত্যাদি। কেননা এটা স্বাভাবিক বিষয় যে, ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা ভিত্তিতে খবরের নির্ভরযোগ্যতায় পার্থক্য হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত হলো, খবর পৌঁছার পদ্ধতি, কেননা এমন একটি খবর, যা অনেক মানুষ জানার কথা, কিন্তু এ ব্যাপারে মাত্র এক-দুজন খবর দিচ্ছে তাহলে খবরটির নির্ভরযোগ্যতায় তা প্রভাব ফেলবে। উদাহরণত আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় পুরা এলাকার কেউ চাঁদ দেখেনি, কিন্তু দু-একজন এসে বলল যে, আমি চাঁদ দেখেছি, তখন এ খবর গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা আকাশ যদি মেঘলা হতো তখন হয় তো বা এ কথা বোঝা যেত যে, মেঘলা থাকার কারণে হয়তো অন্যরা দেখেনি, কিন্তু আকাশ যখন পরিষ্কার সেখানে দু-একজন ব্যতীত আর কেউ না দেখা এটি সন্দেহজনক।

তৃতীয়ত হলো, খোদ খবরটিরও গুরুত্বপূর্ণ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কোনো কোনো খবর রয়েছে, যা খালেছ দ্বীনি ও ধর্মীয় বিষয়াদি, আবার কিছু স্বাভাবিক দৈনন্দিন আচার ও লেনদেনবিষয়ক খবর। কিছু খবর আছে, যার প্রভাব স্বাভাবিক, আবার কিছু আছে নাজুক বিষয়। নাজুক বিষয়াদিতে খবর গ্রহণে খুব বেশি নিরীক্ষণের প্রয়োজন পড়ে, আর স্বাভাবিক বিষয়াদিতে তার প্রয়োজন পড়ে না, কেননা এসব বিষয়ে অধিক যাচাই-বাছাই বা নিরীক্ষণের কারণে জীবনাচারে অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়। (কাশফুল আসরার ২/৫৪৭, ৩/২৪-২৫, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ২/৪২৭-৪২৮)

স্বাভাবিক জীবনাচার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে খবর গ্রহণের বিধান :

স্বাভাবিক জীবনাচার ও লেনদেন বলতে এমন বিষয়াদি বোঝায়, যা দ্বারা অন্য কারো ওপর কোনো দায়িত্ব আরোপ হয় না এবং ঝগড়া-বিবাদের আশংকাও নেই এবং বিষয়টি কোনো খালেছ ধর্মীয় বিষয়ও নয়–এরূপ বিষয়াদিতে খবর

গ্রহণে বেশি যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন নেই, যথা : কারো পক্ষ থেকে কোনো ছোটখাটো জিনিস ক্রয় করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করা হলো, এখন বিক্রেতার এ বিষয়ে যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই যে, বাস্তবেই সে তাকে উকিল নিযুক্ত করেছে কি না ইত্যাদি। তাই এসব বিষয়ে মুসলিম-অমুসলিম, সৎ-অসৎ, বালক-সাবালক সবার খবর গ্রহণযোগ্য। (আলবাহরুর রায়েক ৮/১৮৭, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩০৮)

খালেছ দ্বীনি বিষয়াদিতে খবর গ্রহণের বিধান :

খালেছ দ্বীনি বিষয়াদি বলতে ওই সব খবর বোঝায়, যা বান্দা ও তার রবের মধ্যকার সম্পর্কীয় বিষয়, যেমন কোনো কিছু হালাল বা হারাম হওয়া, পাক বা নাপাক ইত্যাদি। এসব বিষয়ে খবর গ্রহণের জন্য খবর প্রদানকারী ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ও বিবেকবান হওয়া জরুরি, চাই গোলাম হোক বা আজাদ, নারী বা পুরুষ। যেমন কেউ খবর দিল যে, এই পানি নাপাক, তখন লোকটি ন্যায়পরায়ণ মুসলিম হলে তার খবর গ্রহণ করা হবে, অর্থাৎ ওই পানি দ্বারা ওজু করবে না। তবে যদি লোকটি অমুসলিম হয় তখন তার খবর গ্রহণযোগ্য নয়। আর ফাসেক মুসলিম অথবা খবরদাতার ব্যাপারে যদি ভালো-মন্দ না জানা যায় তখন খবরের সত্যতার ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করে নিজের মনের সাক্ষ্য অনুসারে আমল করবে। (রদ্দুল মুহতার ১/৩৭০)

খাদ্যদ্রব্যে হালাল-হারামের খবর গ্রহণের বিধান :

খাদ্যদ্রব্যের হালাল-হারামের খবরটিও যেহেতু একটি খালেছ দ্বীনি বিষয় তাই এ বিষয়ে খবর গ্রহণেও কিছু নীতিমালা রয়েছে। (আলবাহরুর রায়েক ৮/১৮৭)। উদাহরণত, যদি মানুষের মুখে মুখে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো খাবারের হালাল-হারামের ব্যাপারে কোনো খবর প্রচারিত হয়, তখন খবর গ্রহণের জন্য শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয় যে, এ খবর সবার মুখে মুখে রয়েছে এবং হাজারো মানুষ তা বলছে, বরং তার মূল উৎস দেখতে হবে। যদি মূল উৎস অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে খবরটিও অগ্রহণযোগ্য হবে। তাই আমরা এ বিষয়ের বিধান কিছু বিস্তারিত ক্রমিক আকারে আলোচনা করছি :

১. প্রচারিত খবর যদি এমন হয়, যা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে পৌঁছে, অর্থাৎ এত বেশি সংখ্যক মানুষ প্রচার করছে, যাদের মিথ্যার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। সাথে সাথে তার মূলেও ওই পর্যায়ের এত মানুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে এবং খবরের বিষয়টিও পারিপার্শ্বিক নিদর্শনাবলির মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য খবর হতে হবে। এ পর্যায়ের খবর হলে হালাল-হারামের ক্ষেত্রে এমন খবর গ্রহণ করা ওয়াজিব। (দুরারুল হুক্কাম ৪/৪২২) আজকাল খাদ্যদ্রব্যের হালাল-হারামের বিষয়ে এমন খবর খুব কম-ই হয়ে থাকে, অধিকাংশ খবরই ব্যাপক প্রচার হলেও মূল উৎস প্রত্যক্ষ দর্শন ও পর্যবেক্ষণ নির্ভর হয় না।

২. কোনো খাবারের হালাল-হারামের ব্যাপারে কোনো খবর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারিত হলো, কিন্তু তার উৎস এক-দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ হয় তাহলে তা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে না হলেও স্বাভাবিকভাবে তা গ্রহণযোগ্য, তাই তার ওপরও আমল আবশ্যক। (হাশিয়াতুশ শিলবি আলাত তাবঈন ৬/১২)

৩. যদি খবরের উৎস একজন ফাসেক মুসলিম হয় অথবা তার ব্যাপারে ভালো-মন্দ না জানা যায় তখন খবরের সত্যতার ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করে নিজের মনের সাক্ষ্য অনুসারে আমল করবে। যদি সত্যতার পক্ষে প্রবল ধারণা হয় তাহলে গ্রহণ করবে, অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করারও অনুমতি রয়েছে। তা সত্ত্বেও সতর্কতামূলক খবরটি গ্রহণ করা উত্তম, কেননা ফাসেকের খবরের মধ্যে সত্যতারও সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভালো-মন্দ না জানা ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত না হলেও অন্যায় প্রমাণিত নয়। (খোলাসাতুল আফকার শরহুল মানার, পৃ. ১৩৯, রদ্দুল মুহতার ১/৩৭০)

৪. উক্ত তিন নং প্রকারের অবস্থায় যদি চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে কোনো খাবার হারাম হওয়ার খবরটির সত্যতার পক্ষে প্রবল ধারণা হয় তাহলে তো তা থেকে বিরত থাকা উচিত, তবে এর দ্বারা হারাম প্রমাণিত হবে না, তাই প্রয়োজনে সে ব্যবহার করতে পারবে। আর ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা-ফিকির অন্যদের ওপর দলিল নয় বিধায় অন্য মুসলমানদের জন্য ওই ব্যক্তির চিন্তা-ফিকিরের ওপর আমল করা ওয়াজিব নয়। (কাশফুল আসরার ৩/৩/৫১৮)

৫. যদি খবরের উৎস অমুসলিম হয় তখন তার খবর গ্রহণযোগ্য নয়। তবে খবরের সত্যতার ব্যাপারে মনে সাক্ষ্য দিলে সতর্কতামূলক তদনুযায়ী আমল করা উত্তম, যদিও এ অবস্থায় আমল করা অপরিহার্য নয়। আর সত্যতার ব্যাপারে মনে সাক্ষ্য না দিলে সতর্কতা অবলম্বনেরও প্রয়োজন নেই। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩০৮)

৬. যদি একজন সৎ মুসলিম

একটি জিনিসকে পাক বলে, অপরজন নাপাক বলে, তদ্রূপ একজন বলল, এটি মুসলিমের জবাইকৃত পশুর গোশত, আর অপরজন বলল—না, এটি অমুসলিমের জবাইকৃত পশুর গোশত, তাহলে এ ক্ষেত্রেও নিজে চিন্তা-ফিকির করে প্রবল ধারণা মতে আমল করবে। (আলমুহীতুল বুরহানি ৫/১১৬)

৭. যদি উক্ত শর্তসমূহের আলোকে খবরটি এ মানদণ্ডে না পৌঁছে যে, তাকে হারাম বা নাপাক বলা যায়, তার পরও কেউ যদি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকতে চায় তাহলে তা উত্তম, তবে কোনো জিনিসকে প্রমাণ ব্যতীত হারাম বা নাপাক বলা যাবে না।

৮. ভিত্তিহীন খবরসমূহ, মিথ্যা রটনা ও গুজব যার ব্যাপারে কোনো ধরনের প্রমাণ মেলে না এগুলোর শরঈ কোনো মূল্য নেই। (রদ্দুল মুহতার ২/৩৯০)

৯. সাধারণ মিডিয়ার খবর ফাসেকের খবরের ন্যায়, যা যাচাই-বাছাই ও চিন্তা-ফিকির করে গ্রহণ করতে হবে। আর সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে তো আরো অতিরিক্ত সতর্কতা অপরিহার্য। কেননা তার গ্রহণযোগ্যতার মান সাধারণ মিডিয়ার চেয়েও আরো নিম্নতর। (শরঈ গেযাঈ আহকাম, পৃ. ১৫০)

১০. কোনো জিনিসের ব্যাপারে খবর দেওয়ার অর্থ হলো, যা তাদের হাতে আছে বা যার দিকে ইশারা করে খবর দেওয়া হচ্ছে তার বিধান এটি, কোনো প্রমাণ ব্যতীত ব্যাপকহারে সকল জিনিসের ক্ষেত্রে ওই বিধান প্রযোজ্য নয়। তবে যদি কোনো মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এজাতীয় অন্য দ্রব্যসমূহেও এই অবৈধ উপাদান রয়েছে, তাহলে সবগুলোর বিধান এক হবে। (শরঈ গেযাঈ আহকাম, পৃ. ১৫০)

১১. আর যদি কোনো জিনিসের ব্যাপারে কোনো খবর জানা না থাকে তাহলে ওই জিনিস গোশত বা তার দ্বারা তৈরি না হলে তা হালাল বলে ধর্তব্য হবে।

১২. যদি কোনো জিনিসের ব্যাপারে এমন খবর হয় যে ব্যাপারে নিশ্চয়তার জন্য সে বিষয়ক বিজ্ঞদের পরামর্শের প্রয়োজন হয়, তখন সে বিষয়ক বিজ্ঞজনদের পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য।

হারাম নাম ও আকৃতিসম্পন্ন দ্রব্যের বিধান :

কিছু প্রডাক্ট এমন রয়েছে, যা হালাল খাদ্য, তবে সেগুলো কুকুর, বিড়াল, সিংহ ও ক্রুশের ছবির আকৃতিতে বানানো হয়। ক্রুশচিহ্ন তো অমুসলিমদের ধর্মীয় প্রতীক। আর যেকোনো জীবের ছবি বানানো শরীয়তে হারাম। তা ছাড়া হালাল খাদ্য যদি হারাম জীবের ছবিতে বানানো হয় তাহলে ছবি বানানোর গোনাহের সাথে সাথে হালাল-হারামের যে বোধ-বিচার অন্তরে থাকে তাও চলে যায়, এমনকি পাপাচারের অপ্রয়োজনীয় প্রচারও হয়ে থাকে। তাই এসব কাজ হারাম হওয়া তো বলাই বাহুল্য, তবে এজাতীয় খাবার খাওয়া হারাম না হলেও এসব থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য।

কখনো কখনো এমন হয় যে, হালাল খাদ্যকে হারাম জিনিসের নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন 'হট-ডগ'। এটি মুসলিম দেশসমূহে হালাল প্রাণীর গোশত দ্বারা বানানো হলেও খাদ্যটির এই হারাম নামটিই ব্যবহার হয়ে থাকে। তদ্রূপ কোনো হারাম বস্তুর শুরুতে যেমন ওয়াইন, মদ ইত্যাদির শুরুতে 'ইসলামী' অথবা 'হালাল' শব্দ যোগ করে 'ইসলামী ওয়াইন' বা 'হালাল ওয়াইন' নাম দিলে তা বৈধ হয়ে যাবে না—তো হালাল খাদ্য-পানীয় হারাম নামে নামকরণের দ্বারা এগুলো হারাম না হলেও এসব থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য। যদিও শুধু নামের কারণে কোনো হালাল খাবার হারাম হয় না। কিন্তু এজাতীয় নামের খারাপ প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। কেননা এসব নামের পেছনে অনৈসলামিক কৃষ্টি-কালচার জড়িত। তা ছাড়া আমরা এজাতীয় নাম ব্যবহারে তো বাধ্য নই। আর এতে তো ইসলামী আত্মসম্মানবোধের ব্যাপারও আছে। আমাদের তো বিকল্প উত্তম জিনিস ও নাম রয়েছে। আমরা কেন এমন জিনিস ব্যবহার করতে যাব, যা অমুসলিম সভ্যতার বার্তাবাহী। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে আরবী ধনুক ছিল। একজন সাহাবীর হাতে পারসিক ধনুক দেখতে পেয়ে ইরশাদ করলেন,

ما هذه؟ ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها، ورماح القنا، فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين، ويمكن لكم في البلاد

(قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ١٦٦/٣)

অর্থ : "এটি কী? তা রেখে দাও, এগুলো ও এ জাতীয়গুলো (আরবী ধনুক) এবং বর্শা-বল্লম ব্যবহার করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মাধ্যমে তোমাদের দ্বীনের সাহায্য করবেন এবং জমিনে তোমাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ২৮১০)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হালাল খাবার গ্রহণ ও হারাম থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন! আমীন।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : পর্দা

মাওলানা সাইফুল্লাহ
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

(ক) স্বাক্ষী এবং স্বীকারোক্তি এর সংজ্ঞা কী? উভয়ের মাঝে পার্থক্য কী? কোনো একক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি দ্বারা কোনো জিনিস বাস্তবায়িত হবে? নাকি এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা আছে?

(খ) আমার আপন খালা আমাকে বলছে, তুমি যখন দুধের বাচ্চা ছিলে তখন একবার তুমি খুব কাঁদছিলে, তোমার মা উপস্থিত ছিল না। এমতাবস্থায় আমি তোমাকে আমার বুকের দুধ পান করিয়ে ছিলাম। কাজেই তুমি আমার মেয়েদের সামনে আসতে পারবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, খালার কথাটি কি আমার জন্য شهادت হবে নাকি اقــــرار হবে এবং আমার খালাতো বোনদের সাথে পর্দার হুকুম কী? মাসআলাটি দুজন মুফতি সাহেবের কাছে বর্ণনা করেছি–তো একজন উত্তর দিয়েছেন তুমি احتيــاط করে চলো, কেননা তোমার খালা একা বলেছেন। অন্য মুফতি সাহেব বলেছেন شهادت এর ব্যাপারে দুজন লাগে এটা اقــرار এখন দুজন লাগবে না। এখন আমার আবেদন হলো, এ ব্যাপারে সঠিক ফাতাওয়া জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

সত্য বিষয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়াকে شهادت (স্বাক্ষী) বলে, আর নিজের ওপর অন্যের হক্বের কথা স্বীকার করে সংবাদ দেওয়াকে اقـــــــرار (স্বীকারোক্তি) বলে। তাই কোনো একক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি কেবল নিজের ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে দুধ সম্পর্ক শরয়ী সাক্ষ্য ছাড়া প্রমাণিত হয় না। বিধায় আপনার খালা তার থেকে আপনার দুধ পান করার বিষয়টি শরয়ী সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত করতে না পারলে খালার মেয়েদের সাথে পর্দা করে চলবেন। তবে সতর্কতামূলক তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক না করা উচিত।

উল্লেখ্য যে আপনি যদি তার থেকে দুধ পান করার বিষয়টি স্বীকার করে থাকেন। তাহলে দুগ্ধসম্পর্ক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (সহীহুল বোখারী-৫১০৪, আদ্দুররুল মুখতার ২/৯০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৪/১৫৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-৯/২৬৯)

প্রসঙ্গ : রেশন কার্ড

জাকির হোসেন (এএসআই)
পুলিশ লাইনস, মিরপুর-১৪, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

(১) আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রেশন কার্ড এই শর্তে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে যে যখনই (আনুমানিক ছয় মাস বা এক বছর পর) কার্ড বিক্রেতা এক লক্ষ টাকা ফেরত দেবে, তখন কার্ড ক্রেতাও কার্ড ফিরিয়ে দেবে। এর মধ্যবর্তী সময়ে কার্ড ক্রেতা কার্ড দ্বারা কর্তৃপক্ষ হতে নির্ধারিত স্বল্পমূল্যে কিছু পণ্য ক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করে থাকবে। এভাবে রেশন কার্ড বিক্রি করা জায়েয আছে কি না?

উল্লেখ্য রেশন কার্ড হলো, সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত এমন কার্ড, যা দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু পণ্য স্বল্পমূল্যে (উদাহরণস্বরূপ ৪০ টাকা মূল্যের ১ কেজি চাল ১ টাকায়) ক্রয়ের অধিকার লাভ হয়।

(২) আরো একটি বিষয় জানতে চাই, কোরআনে কারীম, দ্বীনি কিতাবাদি এবং দুনিয়াবী শিক্ষার বিভিন্ন বইপুস্তক পড়ার জন্য ভাড়ায় দেওয়া যাবে কি? দলিলাদির আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

(১) প্রশ্নোক্ত রেশন কার্ড মূলত নামমাত্র মূল্যে ভোগ্য পণ্য ক্রয়ের একটি অধিকার মাত্র। এ ধরনের অধিকার ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তদুপরি যদি কেউ এই ধরনের কার্ড ক্রয় করে সুবিধা ভোগ করে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সহীহ মুসলিম : ২/৫, আদ্দুররুল মুখতার : ৪/৫১৬, রদ্দুল মুহতার : ৪/৫১৭, ফেকহী মাকালাত : ১/২১৮)

(২) কোরআনে কারীম, দ্বীনি কিতাবাদি বা দুনিয়াবী কোনো বইপুস্তক পড়ার জন্য ভাড়ায় দেওয়া জায়েয নেই। (রদ্দুল মুহতার : ৯/৫৭, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ৪/২৫৯)

প্রসঙ্গ : প্রাণীর ছবি

রাহাত
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

(১) শুনেছি প্রাণীর ছবি আঁকা ইসলামে হারাম। তবে ইনভেস্টিগেশনে অনেক সময় প্রাণীর ছবি আঁকা বাঞ্ছনীয়। আর যারা ছবি আঁকছে তারা এটি শেখার জন্য প্রথম দিকে অনেক ছবি এঁকেছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?

(২) দুনিয়া ধ্বংসের আগ মুহূর্তে আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.)-কে পাঠাবেন। তিনি আসার পর মৃত্যুবরণ করবেন। এরপর ধীরে ধীরে মানুষ আবার গোমরাহীর পথে লিপ্ত হবে। আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তিনি কি দুনিয়া ধ্বংসের আগের দিন দুনিয়াকে সুন্দররূপে সাজাবেন নাকি সাজাবেন না?

সমাধান :

(১) ইসলামে প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম। হাদীস শরীফে শিল্পী বা চিত্রকারের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই শরয়ী ওজর বা সরকারি আইনের বাধ্যবাধকতা ব্যতীত কোনো প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা বৈধ হবে না। (সহীহ বোখারী : ৫৯৫০, রদ্দুল মুহতার : ১/৬৪৭)

(২) হাদীস শরীফের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে কিয়ামতের আগে যখন ইমাম মাহদী পৃথিবীতে এসে সমস্ত অন্যায়-অবিচার উৎখাত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। তখন আকাশ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষিত হবে। এবং জমিতে প্রচুর পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়ে গোটা পৃথিবী ফলে-ফুলে সুসজ্জিত হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হলে তাকে হত্যা করার জন্য হযরত ঈসা (আ.) অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে তার চেলা-চামুণ্ডাসহ খতম করে দেবেন। ইমাম মাহদী ইন্তেকাল করবেন। তারপর হযরত ঈসা (আ.)ও অবতরণের সাত বছর পর ইন্তেকাল করবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা শাম দেশের দিক থেকে এক প্রকার আরামদায়ক বাতাস প্রবাহিত করবেন, যার দ্বারা মুসলমানগণ সামান্য অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে থাকবে। পুরো দুনিয়া শিরক-কুফরে ভরে যাবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। তখন কোনো ভালো মানুষ থাকবে না। যারা থাকবে তারা হবে দুশ্চরিত্রবান নিকৃষ্ট লোক। তবে তাদের কোনো অভাব-অনটন থাকবে না। খুব স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে থাকবে। এভাবে চলতে চলতে যখন ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়ার মত কোনো লোক বাকি থাকবে না, তখন এই নিকৃষ্ট লোকদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (সহীহ মুসলিম : ৪৯৫৭, মুসতাদরাকে হাকিম : ৫/৪৫৫)

প্রসঙ্গ : ব্যাংক লোন

মুহাম্মদ রিমন মিয়া
পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

জনাব! কোম্পানি তার ব্যবসায়ের কাজে ব্যাংক থেকে লোন নিলে মধ্যস্থতা হিসেবে কাজ করাটা কতটুকু শরীয়তসম্মত। জানালে কৃতজ্ঞ হবো। উল্লেখ্য যে উক্ত কোম্পানিতে চাকরি করি বিধায় কোম্পানির প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয়।

সমাধান :

সুদি লেনদেন করা এবং এর সাক্ষী হওয়া, হিসাব-নিকাশের রক্ষক হওয়া অথবা এ কাজের সহযোগী হিসেবে এগিয়ে আসা হারাম। সুতরাং ব্যাংক থেকে সুদের ওপর লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা হিসেবে কাজ করাটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। তাই তা বর্জন করা আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে যদি কোম্পানি কর্তৃক এ কাজের জন্য বাধ্য করে তাহলে অন্য কোনো হালাল কর্মস্থান না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত চাকরি না ছাড়ার অনুমতি আছে। তবে এর জন্য ইস্তিগফার করতে থাকবে। এবং হালাল চাকরি তালাশের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। (আদ্দুর রুল মুখতার : ৬/৩৬০, আহসানুল ফাতাওয়া : ৮/২২৬)

প্রসঙ্গ : বর্গা

মুহাম্মদ রাসেল আহমদ

জিজ্ঞাসা :

(ক) আমি একটি গরু ক্রয় করে এক লোককে লালন-পালন করতে দিলাম এই শর্তে যে এটি দুই বছর পর বিক্রি করে লভ্যাংশ উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নেব।

এখন আমার জানার বিষয় হলো, এমন অংশীদারি ব্যবসা আমার জন্য বৈধ হবে? যদি না হয়, বৈধতার পদ্ধতি কী হবে?

(খ) একজন ব্যক্তি আমার কাছে দশ মণ ধান বিক্রি করবে এভাবে যে আমি তাকে ঋণের সিজনের ৬ মাস পূর্বে পাঁচ হাজার টাকা দেব, আর সে আমাকে সিজন এলে দশ মণ ধান দেবে।

আমার জানার বিষয় হলো, এমন লেনদেন আমার জন্য বৈধ হবে? যদি

না হয় তবে বৈধ পদ্ধতি কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

(ক) প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবসা বৈধ নয়। তবে এর সঠিক পদ্ধতি এভাবে হতে পারে যে গরু বর্গা দেওয়ার পূর্বে বর্গাদাতা গ্রহীতাকে উক্ত গরুর মূল্যের যেকোনো এক অংশে যেমন একশত টাকার অংশে হলেও শরীক করে নেবে এবং পরবর্তীতে বিক্রি করে চুক্তি মোতাবেক লভ্যাংশ ভাগ করে নেবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : ৪/৪৪৫-৪৪৬, এমদাদুল ফাতাওয়া : ৩/৩৪২)

(খ) প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে লেনদেন নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে বৈধ।

১. পণ্যের সঠিক পরিচয় ও গুণ বর্ণনা করা।

২. পণ্য ও মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

৩. পণ্য পরিশোধের সময়সীমা ঠিক করা।

৪. পণ্য আদায়ের স্থান নির্ধারণ করা।

৫. এ সমস্ত শর্তসমূহ মেনে নেওয়ার পর চুক্তির স্থানেই মূল্য পরিশোধ করা। (আল বাহরুর রায়েক : ৬/১৬০, কিফায়াতুল মুফতী : ২৮২)

প্রসঙ্গ : পাখি শিকার

মুহাম্মদ সালমান আহমদ
সুনামগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমি ইয়ারগান এবং পাথর নিক্ষেপ করে পাখি শিকার করে থাকি এবং বিসমিল্লাহ বলেই নিক্ষেপ করি; তবে অনেক সময় দেখা যায় আঘাত করছে কিন্তু রক্ত বের হওয়ার কোনো নিশান নেই। এখন আমর জানার বিষয় হলো, এভাবে শিকারের পর মৃত পাওয়া গেলে পাখিটি খাওয়া হালাল হবে কি না?

সমাধান :

পাথর, ইয়ারগান বা এজাতীয় কোনো অস্ত্রের আঘাতে শিকার মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না, রক্ত বের হোক বা না হোক। তবে শিকার জীবিত পাওয়া গেলে এবং শরয়ী পন্থায় জবেহ করা হলে তা খাওয়া হালাল হবে। (সূরা মায়েদাহ : ৩, রদ্দুল মুহতার মা'আদ দুররুল মুখতার : ৬/৪৭১, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া : ১৮/৪৭৫)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

আলহাজ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
কাদিরপাড়া, শ্রীপুর, মাগুরা।

জিজ্ঞাসা :

বিনীত নিবেদন এই যে আমাদের মহল্লায় একটি মসজিদ, যার আনুমানিক বয়স ৩০ বছর। লোকসংখ্যা সংকুলান না হওয়ায় আমরা মসজিদটি আপন জায়গা থেকে সরিয়ে তার ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে বড় করে মসজিদ তৈরি করার মনস্থ করি।

এখন আমার জানার বিষয় হলো, পুরাতন মসজিদটি ভেঙে দিয়ে ওই জায়গাতে মসজিদের আয়ের জন্য মার্কেট অথবা ইমাম-মুয়াজ্জিন হযরতগণের জন্য বাসা, অথবা ঈদগাহ বানানো যাবে কি না? এবং ওই মসজিদটির স্থানান্তরের আর পুরাতন মসজিদটি ব্যবহারে শরয়ী পদ্ধতি কী?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ নির্মাণ করা হয় তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদই থেকে যায়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত পুরাতন মসজিদ স্থানান্তর করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, যদি উক্ত মসজিদে লোক সংকুলান না হয় তাহলে পুরাতন মসজিদটি বহুতল করে নির্মাণ করা যেতে পারে, অথবা তা বহাল রেখে অন্যত্র কোনো নতুন মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত পরিকল্পনা তথা পুরাতন মসজিদ ভেঙে সেখানে নতুন মসজিদের আয়ের জন্য মার্কেট, ইমাম-মুয়াজ্জিনের বাসা, ঈদগাহ ইত্যাদি নির্মাণ করা কিছুতেই বৈধ হবে না। (আল বাহরুর রায়েক : ৫/৪২১, ফতহুল ক্বাদীর : ৬/২১৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ৬/১৬৫, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ১৪/৬১, ফাতাওয়ায়ে উসমানী : ২/৫১১)

প্রসঙ্গ : বিকাশ ইত্যাদি

মুহাম্মদ আমীর হোসেন
ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ঢালিবাড়ী, ভাটারা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

(১) বিকাশ ও লোডের ব্যবসা জায়েয কি না?

(২) বর্তমানে বাচ্চা ও মহিলাদের যে টিকা দেওয়া হয়, তা জায়েয কি না? শরীয়তসম্মতভাবে এটা আসলে কী? জানালে উপকৃত হবো।

(৩) জনাব, আমার জানার আরেকটি বিষয় হলো, কোনো মহিলা সন্তান প্রসবের দেড় বা দুই মাস পর নতুন করে সন্তান গর্ভে ধারণ হয়ে যায়। তাই এখন বাচ্চা ও মায়ের দুর্বলতার দিকে লক্ষ করে উক্ত গর্ভকে ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে নষ্ট করে দিলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম কী? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো। উল্লেখ থাকে যে উক্ত গর্ভের বয়স দেড় বা দুই মাস।

সমাধান :

(১) বিকাশ সার্ভিসের মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদান করা ও লোডের ব্যবসা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। (আদ্দুররুল মুখতার মা'আর রদ : ৬/৬৪, রদ্দুল মুহতার : ৬/৬৪, এমদাদুল ফাতাওয়া : ৩/১৪৫)

(২) বর্তমানে বাচ্চা ও মহিলাদের যে টিকা দেওয়া হয়, যেহেতু তা চিকিৎসার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাই জায়েয। (আদ্দুর মুখতার : ৬/৩৮৯, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ১৬/৩০৯)

(৩) অভিজ্ঞ পরহেজগার ডাক্তার যদি মা অথবা বাচ্চার স্বাস্থ্যের অবনতির প্রবল আশঙ্কা করে এবং গর্ভধারণের সময় ১২০ দিন, অর্থাৎ চার মাসের কম হয়, তাহলে নিরাপদ পদ্ধতিতে গর্ভপাত ঘটানোর অনুমতি আছে। (আদ্দুল মুখতার মা'আর রদ : ৬/৪২৯, আহসানুল ফাতাওয়া : ৮/৩৪৭)

প্রসঙ্গ : ঘুষ

শহিদুর রহমান

খিলক্ষেত, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

মুহতারাম, আমি একজন গার্মেন্ট মালামাল সরবরাহকারী। বিভিন্ন সময় আমার মালামাল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারকে টাকা প্রদান না করলে তিনি আমার থেকে মাল ক্রয় করেন না। উল্লেখ্য যে ম্যানেজারের টাকা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ মোটেই অবগত নন। এমতাবস্থায় বিক্রেতা/সরবরাহকারী হিসেবে কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে উক্ত ম্যানেজারকে টাকা প্রদান করা আমার জন্য শরীয়ত পরিপন্থী কি না? কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার ব্যাপারে হাদীস শরীফে রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে কঠিন হুঁশিয়ারি এসেছে, বর্তমান রাষ্ট্রীয় আইনেও তা দণ্ডনীয় অপরাধ। বিধায় একান্ত অপারগতা ছাড়া ঘুষ প্রদান করা হারাম।

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে অবগত করা ছাড়া ম্যানেজারকে টাকা প্রদান করা জায়েয হবে না। (আবু দাউদ : ৩৫৮০, রদ্দুল মুহতার : ৫/৩৬২, ফতহুল ক্বাদীর : ৭/২৫৫, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১০/৩৩৯)

প্রসঙ্গ : সম্মিলিত দু'আ

নূর মোহাম্মদ

ফুলগাজী, ফেনী।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমানে আমাদের দেশে ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে যে দু'আ করা হয় কেউ বলেন, এটা জায়েয বরং মুস্তাহাব এবং কেউ বলেন, জায়েয তবে শর্ত সাপেক্ষে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুনাজাত কি জায়েয নাকি নাজায়েয? যদি জায়েয হয় তবে তার দলিল কী? আর যদি নাজায়েয হয় তাহলে তার দলিল কী? আর যদি মুস্তাহাব হয় তবে তার দলিল কী? এবং যদি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয হয় তাহলে শর্তগুলো কী? আর বর্তমানে অনেক মসজিদে দেখা যায় বরং প্রায় মসজিদে যদি কেউ মুনাজাত ব্যতীত উঠে যায় তাহলে তাকে গালমন্দ করা হয়। নয়তো তাকে অন্য চোখে দেখে এবং অনেক মসজিদে মুনাজাতের কারণে, অর্থাৎ মুনাজাত না করার কারণে ইমাম সাহেবকেও বহিষ্কার করা হয়। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

সমাধান :

জরুরি মনে না করে এবং মাসবুকের নামাযে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত জায়েয। তবে একে জরুরি বা নামাযের অংশ মনে করলে বিদ'আত বলে গণ্য হবে। আর শরীয়তের জায়েয বিষয়গুলো ঐচ্ছিক হওয়ার কারণে আদায় না করা অপরাধ নয়। তাই এ জন্য কাউকে বরখাস্ত করা জুলুম বলে বিবেচিত হবে। (জামিউত তিরমিযী : ৩৪৯৯, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৩৩, ফয়যুল বারী : ২/২১৩, মা'আরেফুস সুনান : ৩/১২১, এমদাদুল ফাতাওয়া : ১/৮০২, কিফায়াতুল মুফতী : ৩/২৮০, আহসানুল ফাতাওয়া : ৩/৬২)

প্রসঙ্গ : মোবাইল স্ক্রিনে কোরআন স্পর্শ করা

মোহাম্মদুল্লাহ

ব্লক-কে, বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

অ্যানড্রয়েড মোবাইলে অথবা টাচ ল্যাপটপে কোরআন তিলাওয়াতের সময় কোরআনের সাদা অংশে ওজুবিহীন স্পর্শ করা যাবে কি না? বিস্তারিত দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে জানালে খুশি হবো।

সমাধান :

অ্যানড্রয়েড মোবাইল অথবা টাচ ল্যাপটপে স্ক্রিনে দৃশ্যমান থাকা অবস্থায় কোরআন কারীমের কোনো অংশ ওজুবিহীন স্পর্শ করা যাবে না। (রদ্দুল মুহতার : ১/২৯৩, মুখতাছারুল কুদূরী : ৪৫, কিতাবুন নাওয়াযেল : ১৫/৫১)